গোধূলির গান

স্টিফান জাইগ

অনুবাদ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স : কলিকাতা-১৪

কথাশিল্পী সন্তোষকুমার ঘোষ

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা

চন্দ্রসূর্য

গল্প

রাম-রহিম

রাত্রির আকাশে সূর্য

অনূদিত উপন্যাস

অন্তর্জ্বালা

শাদা-কালো (যন্ত্রস্থ)

বিপ্লব আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা কি পরস্পর-বিরোধী? বিপ্লবী ব্যক্তি-স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দেবে? ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদী মুখ ফিরিয়ে থাকবে বিপ্লবের দিকে? মনের স্বাধীনতা বজায় রেখেও কি বিপ্লবী আদর্শের প্রচার সম্ভব?

প্রথম মহাযুদ্ধের বছর চারেক পরে রলাঁ এই ধরনের একটা প্রশ্ন ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবীদের কাছে উপস্থাপিত করেন। আত্ম-জিজ্ঞাসার অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি নিজেই তখন ক্ষতবিক্ষত।

রলাঁর ডাকে অনেকেই সাড়া দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েও বিনাশর্তে চিন্তার স্বাধীনতার স্বপক্ষে রায় দেন। এঁদের মধ্যে জর্জ দুআমেল ও স্টিফান জাইগের নাম উল্লেখযোগ্য। বিরোধী দলে ছিলেন মার্শেল মার্তিনে। এবং আরো অনেক। ব্যক্তির থেকে বিপ্লবকে এঁরা বড় করে দেখেছিলেন।

জাইগ মনে করতেন: কোন দল, এমন-কি পৃথিবীর স্বাধীনতার চেয়েও মনের স্বাধীনতা অনেক বড়—অনেক বেশি দরকারী। রাজনীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি বলতেন, সৎ ও আত্মসচেতন হলে সাহিত্যিক মাত্রেই বিপ্লবী হতে পারেন।

এইখানেই জাইগের ট্রাজেডি। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর অন্যতম

শেষ উত্তরাধিকারী তিনি। কিন্তু রেনেস াঁর মন—গতযুগের ধ্যানধারণা—নিয়ে তো আজকের পৃথিবীকে বিচার করা চলে না, শিল্পীর পক্ষেও বাঁচা অসম্ভব। হয় তাঁকে নিজের জন্মান্তর ঘটাতে হয়, নয় আত্মবিলোপ। দুই দিকের দুই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—রলাঁ আর জাইগ। রলাঁর ঘটেছিল নতুন জীবনে উত্তরণ, জীবনসন্ধ্যায় সস্ত্রীক আত্মহত্যা করলেন জাইগ।

ভিয়েনার এক সম্ভ্রান্ত ইহুদী পরিবারে জাইগের জন্ম—১৮৮১ সালে। জীবনের মোড়ে মোড়ে তাড়া খেয়ে তিনি সাহিত্যের অগত্যা-আশ্রয় এসে নেননি—জাইগ জাত সাহিত্যিক, কৈশোর থেকেই সাহিত্যজগতের অভিযাত্রা। জীবন ও শিল্পকে তিনি কোনদিন বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি—সত্যিকারের জীবন-শিল্পী তিনি।

চেতনার প্রত্যূষ থেকেই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর অপরিমেয় কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা। ছাত্রজীবনে অনেকেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনী মুখস্থ করেন, স্বাক্ষর-সংগ্রহ অভিযানে মেতে ওঠেন, কোন কবি বা কথাশিল্পীকে একবার শুধু চোখের দেখা দেখবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন। জাইগও থাকতেন। কিন্তু এটা যে তাঁর নিছক শিশুয়ালী খেয়ালখুশি নয়, জাইগের পরবর্তী জীবনই তার বড়

প্রমাণ। যখন তিনি নিজে বিশ্রুতকীর্তি, অতীত-বর্তমান বিখ্যাত লেখকদের সম্পর্কে তখনও তাঁর কৌতূহলের অবধি নেই। তবে, এবার আর স্বাক্ষর নয়—পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ। পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় স্রষ্টার রক্তমাংসের স্পর্শ মেলে। ইতস্তত কাটাকুটি আর আঁকিবুঁকি—কিন্তু এ তো শুধু কালির আঁচড় নয়, লেখক-মনের জীবন্ত রেখাচিত্র, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ইতিহাস। *কি করে ফুল ফোটে দেখার জন্যে বুনিন একদা প্রচণ্ড শীতের রাতে রাতভোর বাগানের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিলেন ফুলগাছের দিকে। জাইগের তুলনা তাঁর সঙ্গে।

কৌতূহল শুধু কি লেখকদের সম্পর্কে? আঠারো থেকে তিরিশ—এই দীর্ঘ বারো বছর ধরে পৃথিবী পর্যটন করেছেন। লিখেছেন অফুরন্ত, একের পর এক ভাষা শিখেছেন, দেখেছেন নতুন নতুন দেশ, বিচিত্র-বিচিত্রতর নরনারী। পারী রোম ফ্লোরেন্স, স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ড আমেরিকা, কানাডা মেক্সিকো, ভারত চীন আফ্রিকা—সারা পৃথিবীকে আপন বলে বুকে টেনে নিয়েছেন। এই পর্যটনে প্রতিটি দেশের অগ্রণী লেখকদের যেমন পেয়েছেন বন্ধু হিসেবে, তেমনি সাহচর্যে এসেছেন অগণন সাধারণের।

এই বিশ্ব-সফর বৃথা যায়নি। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে

রচিত, চরিত্রগুলি বাস্তব জীবন থেকে উঠে-আসা—"…বিশেষ করে, যার দুর্নাম যত বেশি হত, তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের আকর্ষণ আমি তত বেশি অনুভব করতাম। 'বিপজ্জনক' ভাবে যারা জীবন কাটায় তাদের প্রতি আমার অগাধ কৌতূহল, তাদের আমি ভালোবাসি।……আমার বহু গল্প-উপন্যাসে এই সব অস্বাভাবিক বিচিত্র-চরিত্র নরনারীর সন্ধান মিলবে—এদের আমি একটা অনন্য মর্যাদা দিয়েছি।"

সব্যসাচী লেখক জাইগ। কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, জীবনী, ইতিহাস, উপকথা, ভ্রমণকাহিনী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ, অনুবাদ—সাহিত্যের হেন শাখা নেই যেখানে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পড়েনি। তাঁর আত্মজীবনী *The World of Yesterday* তো এক অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি।

জাইগের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য : কবিতা—*Silver strings* ও *Early garlands* ; নাটক ও কাব্যনাট্য—*Jeremiah, Thersites, The House by the Sea* ও *Legend of a Life* ; উপকথা—*The Eyes of the Undying Brother* ও *Rachel Complains to God* ; ভ্রমণকাহিনী—*Journeyings* ; গল্প-উপন্যাস—*Beware of Pity, First Experience, Amok* ('গোধূলির গান') *The Royal game, The Burning Secret* ('অন্তর্জ্বালা') *Letter from an Unknown Woman* ; ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্রণ—*Mary*

Queen of Scots, ও *Marie Antoinette* ; প্রবন্ধ—*Our Time and World* ও *Healers through the Spirit.*

'গোধূলির গান'-এর ফরাসি অনুবাদের ভূমিকায় রলাঁ বলেছিলেন।···The characteristic trait in (Zweig's) artistic make-up is the passionate desire to recognise, the unflagging, insatiable curiosity, the demonic urge to see, to know, to live every life himself. It has made of him a veritable 'Flying Dutchman', a passionate pilgrim. He is the impudent yet devout admirer of genius, whose mystery he has plucked out only to love it more deeply, the poet who has made Freud's dangerous key his own—the soul-snatcher. জাইগের মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার নিরঙ্কুশ প্রশংসা করেন ফ্রয়েড। তাঁর Selected short Novels-এর রুশ অনুবাদের ভূমিকায় গর্কি তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানান। অনুবাদক হিসেবে জাইগের খ্যাতি জার্মান সাহিত্যে অনন্য-সাধারণ এবং পৃথিবীর আর-কোন প্রথম শ্রেণীর লেখক অনুবাদক হিসেবেও—রচনার গুণে ও পরিমাণে—এতখানি সাফল্য অর্জন করেছেন কিনা সন্দেহ। বিখ্যাত বেলজিয়ান কবি ভেরহেএর্‌ন্‌-এর কয়েকটি কবিতা ও নাটক তিনি সর্বপ্রথম

অনুবাদ করেন। তারপর একেএকে বদলেয়ার. ভার্লেন কীটস মরিস প্রমুখ আরও অনেকের কবিতা, রলাঁর উপন্যাস— ইত্যাদি। স্রষ্টা সাহিত্যিকের হাতেই যে অনুবাদের সার্থকতা— জাইগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শুধু বিদেশি সাহিত্যিকদের রচনার অনুবাদ নয়, রলাঁ, মার্শেল প্রুস্ত, বায়রন প্রমুখের জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে জাইগ যেসব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছেন তাও এক নতুন সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ স্মরণীয় তাঁর রলাঁ সম্পর্কিত বইটি। গর্কি ও দুআমেল এত তাঁকে সহযোগিতা দেন।

নিজে অত বড় সাহিত্যিক হয়েও কেন অন্যের লেখা অনুবাদ করতেন? তাঁর একটি উদাত্ত ঘোষণা এক্ষেত্রে—নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য—"......আমরা নিজেদের বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রীর প্রতীক বলে মনে করি। সমস্ত পার্থক্য বিসর্জন দিয়ে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ: উত্তরপুরুষকে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব আমাদের। এর জন্যে ন্যায়ের স্বপক্ষে আমরা অপরিমিত উৎসাহ নিয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাব। একথা বলাই বাহুল্য যে এমন একটি শব্দও আমরা লিখব না যার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অবিশ্বাস দেখা দেয়। প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের মর্যাদায়, এমন কি তার অহমিকায়ও আঘাত হানে এরকম একটি কথা লিখেও আমরা আমাদের কলমকে কলঙ্কিত করব না। সঙ্গে সঙ্গে

একটি নির্দিষ্ট কর্তব্যও আছে—প্রতিবেশি দেশের মহৎ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে নিজের দেশের ও সারা পৃথিবীর জনসাধারণের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হবে। আমরা—লেখক শিল্পী ও সঙ্গীত-সাধকরা—এক অখণ্ড আত্মিক সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা সমস্ত দেশের সকল জাতির একটিমাত্র আদর্শের লক্ষ্য অভিমুখে চলেছি। নিজেদের আচার-আচরণের সাহায্যে তরুণদের আমরা বুঝিয়ে দেব—মানবমনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি সর্ব দেশের, বিশ্বজনীন।"

এই বিশ্বদৃষ্টি ও মানবপ্রেম রেনেসাঁর দান। কিন্তু আগেই বলেছি ঃ রেনেসাঁর চোখ দিয়ে আজকের পৃথিবীকে বিচার করা চলে না।

প্রথম মহাযুদ্ধ জাইগের মনে প্রথম আঘাত হানল। মানব জাতির আসন্ন বিপর্যয়ের আভাসে তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তাঁর শিল্পীমন প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াল—প্রকাশিত হল *Jeremiah.* হিংসা নয়, অহিংসা। হানাহানি নয়, মৈত্রী। মানুষের বিবেকের উদ্বোধন করতে চাইলেন, শান্তির প্রশস্তি গাইলেন। দুর্বলতা ও ভীরুতাকে পরিহার করে আত্মিক বলে বলীয়ান হবার জন্যে মানুষের প্রতি আহ্বান জানালেন। জার্মানীতে এ নাটক নিষিদ্ধ হল।

তখনো জাইগ অপরাজিত। কিন্তু তারপর !

চোখের ওপর একের পর এক ঘটে যায় বিপর্যয়—ক্রমবর্ধমান যুদ্ধপ্রস্তুতি, হিটলারের অভ্যুদয়, বই বাজেয়াপ্ত, চোখের সামনে নিজের সৃষ্টির বহ্ন্যুৎসব, সবশেষে দেশ থেকে লাঞ্ছিত-অপমানিত-বহিষ্কৃত। বিশ্ব জুড়ে ধ্বংসের তাণ্ডব—তাসের ঘরের মত সব কিছু ভেঙে ভেঙে পড়েছে, রূপ বদলে যাচ্ছে পুরনো-পরিচিত পৃথিবীর। জীবনের দুই শ্রেষ্ঠ বন্ধু গর্কি আর রলাঁ—ব্যবহারিক জীবনে সে বন্ধুত্ব এখনো অটুট, কিন্তু ধীরে ধীরে যেন একটা অন্তরাল গড়ে উঠছে, তিনি একক হয়ে পড়ছেন, দূরে সরে যাচ্ছেন। সব থেকেও কিছু নেই, শুধু সব-হারাণোর একটানা হাহাকার—স্বপ্নশেষের হৃদয়ভেদী ট্রাজেডির সুর।

"......যে-পৃথিবীতে আমি বড় হয়ে উঠেছি আমার সেই পৃথিবী, আজকের এই পৃথিবী আর এ দুইয়ের মাঝখানে যে-পৃথিবী—মনে হয়, এই তিনটি পৃথিবী পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ আলাদা তিনটি পৃথিবী হিসেবে গড়ে উঠছে।......এ জীবনে কত কী দেখলাম: বিপ্লব আর দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব, মহামারী ও নির্বাসন! দেখতে দেখতে কত গণ-মতবাদ গড়ে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল: ইতালীতে ফাশিজম, জার্মানীতে ন্যাশনাল সোসিয়েলিজম, রাশিয়ায় বোলশেভিজম। এবং এর চেয়েও মারাত্মক, সবচেয়ে বিপজ্জনক—ন্যাশনালিজম। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ফুলটিকে বিষাক্ত করে দিল ওই ন্যাশনালিজম। অসহায়ভাবে

আমি চেয়ে চেয়ে দেখেছি মানবজাতির অবর্ণনীয় অপমৃত্যুর দৃশ্য, দেখতে বাধ্য হয়েছি পাশব বর্বরতার অতলে সবকিছু তলিয়ে যাচ্ছে—অথর্ব আমি, শুধু দেখেই গেলাম! যুদ্ধ-নয় ঘোষণার পরেও যুদ্ধ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, নির্যাতন-নিপীড়ন, ব্যাপক নরমেধ যজ্ঞ, রক্ষীহীন শহরগুলির উপর বেপরোয়া বোমাবর্ষণ—এত কিছু প্রত্যক্ষ করাও আমাদের ভাগ্যে ছিল! আমাদের পূর্বপুরুষরা এই নৃশংসতা ভাবতেও পারত না—কামনা করি—আমাদের বংশধরেরাও যেন একে মেনে না নেয়!......১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের সেই দিনটি একটি যুগের অবসান ঘোষণা করে গেল!......তবু যদি আমরা এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে সামান্যমাত্র সত্যের নিদর্শনও উত্তর-পুরুষের জন্যে উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারি, তবে বুঝব জীবন আমাদের একেবারে বৃথা যায়নি।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র জাইগকে সাহিত্যাচার্য বলেছেন।* সত্যি, জাইগ শুধু একজন মহৎ শিল্পীই নন, যুগন্ধর প্রতিভাও। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকীয় ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র তাঁর আচার্যপদ অনায়াসপ্রাপ্য। তিনি ছিলেন আজন্ম শান্তিবাদী, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অপরাজেয় আশাবাদী, সমস্ত অন্যায় ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী, বিদগ্ধমন, সংস্কারমুক্ত, বিশ্বভ্রাতৃত্বের উদ্‌গাতা। মানুষের প্রতি

* 'অস্তজার্লা'র ভূমিকা

প্রগাঢ় প্রেম—সে-মানুষ শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক। তবু কেন স্টিফান জাইগের এই পরিণতি ?

তিনি রেনেসাঁর ধ্যানধারণায় মানুষ। তিন বন্ধু—রলাঁ। জাইগ গর্কি, বিশেষ করে রলাঁ ও জাইগ, একই পথ ধরে যাত্রা শুরু করেন। তারপর যুগসন্ধির মুখে এসে আত্মিক বিচ্ছেদ ঘটে গেল। এ যুগের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সোভিয়েট-বিপ্লব—একটি নতুন যুগের অভ্যুদয়। গর্কি এই বিপ্লবের অংশীদার ছিলেন—তাঁর কথা স্বতন্ত্র। কিছু পরে হলেও এর তাৎপর্য রলাঁ বুঝেছিলেন—রক্তাক্ত বিপ্লবের গর্ভ থেকে নবজাতকের জন্মকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর শিল্পী-জীবনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল।

কিন্তু জাইগ দেখলেন—শুধু রক্তের প্লাবন আর বন্য বর্বরতার অবাধ বিস্তার। শুধু ধ্বংস ধ্বংস—আর ধ্বংস! স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েট এবং বার্লিনে জার্মান সৈন্যের মৃত্যুতে তাঁর হৃদয়-মন সমানভাবেই ব্যথিত হয়ে উঠত—কিন্তু স্তালিনগ্রাদের পরাজয় ও বার্লিনের মুক্তির মধ্যে যে-কত তফাৎ তা উপলব্ধি করার মত ইতিহাস-চেতনার অভাব ছিল তাঁর। জাইগের ট্রাজেডির হেতু এইখানে।

যাক, জাইগের সমালোচনা আজ অবাস্তর। অপিচ, সাহিত্যিকের কি-হওয়া-উচিত-ছিল'র চেয়ে কী তিনি হয়েছেন সেইটেই বড় কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবী দুটি শিবিরে

বিভক্ত হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকরাও এর কোন-এক শিবিরে শামিল হয়ে পড়েন। অনেকে তৃতীয় শিবিরের ছদ্মবেশ নিয়ে নিরপেক্ষতার ভাণে পরোক্ষে শক্তিশালী করেন প্রতিক্রিয়ার শিবিরকে। অবিশ্যি নিরপেক্ষ সাহিত্যিক মাত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল—সরাসরি এ ধরনের রায় দেওয়া অতিবাম-বিচ্যুতি। প্রাক্তনের মোহে, নতুন চেতনার অভাবে এখনো অনেকে নিরপেক্ষ হিসেবে পরিচয় দেন। এঁরা সৎ নিঃসন্দেহে —তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আত্মপ্রতারণা করে স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে কোন পক্ষেই এঁরা যোগ দেননি। কিন্তু প্রশ্ন হল: আজকের বাস্তব পরিবেশে এই সমাজ-বিচ্ছিন্ন একক সততা কতখানি—কতদিন সম্ভব? বহির্জগত ও চিন্তাজগতের এই জটিল দ্বন্দ্বের পরিণাম কী?

জাইগ নিজের শিল্পীধর্মের প্রতি ব্যাভিচার করেননি, আত্ম-প্রতারণার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। তাই কি ষাট বছর বয়েসে নিজের অক্ষমতার মৃত্যুদণ্ড হিসেবে নিজ হাতে তিনি বিষের পাত্র তুলে নিয়েছিলেন?

স্টিফান জাইগ কাপুরুষ? না। আদর্শের নামে বৃহন্নলাবৃত্তির চেয়ে আত্মহত্যাও শ্রেয়, হাজার গুণ শ্রদ্ধেয়॥

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

Stefan Zweig-এর প্রকৃত উচ্চারণ স্টেফান ৎসোয়াইগ। কিন্তু এদেশে তিনি স্টিফান জাইগ নামে পরিচিত বলে এখানে তাই ব্যবহৃত হল।

উনিশ শ বারো সালের মার্চ মাসে নেপল্‌স্‌ বন্দরে মাল খালাস করবার সময় বৃহৎ একটি ডাকবাহী জাহাজে এক দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে খবর বেরোয় তা সম্পূর্ণ ভুল।

আমি নিজ চোখে অবিশ্যি কিছু দেখিনি, কেননা অন্যান্য যাত্রীদের মত আমিও মাল ওঠানো-নামানোর হই-হট্টগোল থেকে রেহাই পাবার জন্যে সন্ধ্যেটা জাহাজ ছেড়ে শহরে গিয়ে কাটিয়ে এসেছিলাম। তবে ঘটনাটা যে কি এবং কেন ঘটেছিল তা আমি জানি।

সেই ঘটনার পর থেকে অনেকগুলি বছর কেটে গেছে, কাজেই এতদিন মুখ বুজে থাকলেও আজ যদি আমি মুখ খুলি তাহলে নিশ্চয় সেটা অসঙ্গত হবে না।

তখন আমি মালয় সফর করছি। হঠাৎ বাড়ি ফেরবার এক

জরুরী তার এল। সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুরে এসে জাহাজে উঠলাম।

জাহাজে আমার কেবিনটি কিন্তু বড় সুবিধের হল না—একেবারে ইঞ্জিনঘরের লাগোয়া, আকারে যেমন ছোট তেমনি গরম আর অন্ধকার। ঘরে ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে আসে, তাই অনবরত ফ্যান চালিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু তাও রীতিমত অস্বস্তিকর—ফ্যান তো নয়, মনে হয় সব সময় যেন মাথার ওপর একটা বাদুড় পাখা ঝাপটাচ্ছে। পাশ থেকে আসছে ইঞ্জিনের অবিরাম গোঙানি। ওপরে আবার ডেক—হরদম লোক চলাচল করছে, তাদের পদচারণার ধুপধাপ শব্দ। তবু ডেকে উঠে গেলে খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। মালপত্র ঠিকঠাক করে রেখে ডেকেই উঠে এলাম।

কিন্তু প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন ডেকেও অশান্তি। চারদিকে যাত্রীর মেলা, তাদের অনর্গল পায়চারী, গল্পগুজব, অলস বিশ্রম্ভালাপ।

মালয়েশিয়া এবং তার আগে বার্মা ও শ্যাম সফরের সময় আমার বারবার মনে হত যেন সম্পূর্ণ নতুন অপরিচিত এক জগতে এসে পড়েছি। নতুন থেকে নতুনতর অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন মন আমার ভরে যেত। ইচ্ছে ছিল, পরে অবসর মত বসে বসে এসব স্মৃতির রোমন্থন করব, অভিজ্ঞতা-গুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সাজিয়ে নেব পরপর।

দুই

কিন্তু এই হুল্লোড়ে কোথায় পাব রোমন্থনের সেই নিরিবিলি অবকাশ? পড়বার জন্যে বই খুলে বসেছি কি শাদা পাতায় যাত্রীর ছায়া পড়ে, অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে ওঠে চোখের সামনে। এই ভীড়ে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্যেও একান্ত করে পাওয়া, নিজের মনের মুখোমুখি হওয়া—অসম্ভব।

অসীম ধৈর্যে দিন তিনেক কাটিয়ে দিলাম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, সহযাত্রীদের প্রতি দৃকপাত না করে।

সমুদ্রের কোন পরিবর্তন নেই—অসীম নীলের রাজ্য, শুধু সন্ধ্যের মুখে কিছুক্ষণের জন্যে নানা রঙের খেলা। তিনদিনের মধ্যেই যাত্রীদের সম্পর্কে হাঁফিয়ে উঠলাম। তাদের সব-কিছু যেন আমার মুখস্থ হয়ে গেল। বীতশ্রদ্ধ হয়ে আশ্রয় নিলাম সেলুনে।

কিন্তু সেলুন থেকেও পালাতে হল—সাংহাইয়ের একদল ইংরেজ তরুণীর গানের গুঁতোয়। অগত্যা আবার নিজের কেবিন। লাঞ্চ শেষে বোতল কয়েক বীয়ার টেনে কেবিনেই ফিরলাম—ডিনার আর নাচের আসর এড়িয়ে খানিকটা সময় অন্তত শান্তিতে কাটুক।

যখন ঘুম ভাঙল, চারদিক অন্ধকার। মনে হল যেন কফিনে শুয়ে আছি। ফ্যান বন্ধ করে দিয়েছিলাম, দরদর করে ঘাম ঝরছে, সুদীর্ঘ ঘুমে মাথা ভারী হয়ে উঠেছে। প্রথমটা বুঝতেই পারিনে, আমি কোথায়? এখন নিশ্চয় মধ্যরাত্রি

অতিক্রান্ত, গানের আওয়াজ আসছে না, মাথার উপরে লোক চলাচলের ধুপধাপ শব্দও নেই। শুধু ইঞ্জিনঘর থেকে শোনা যায় মেশিনের গোঙানি—জাহাজের হৃৎস্পন্দন। অন্ধকার ভেদ করে এগোতে এগোতে হাঁসফাঁস করছে, এক নাগাড়ে গোঙাচ্ছে যান্ত্রিক জানোয়ারটা।

ডেকে উঠে আসি। নির্জন ডেক। নির্মেঘ আকাশ। আকাশে তারার মেলা। অনির্বাণ আলোর প্রবাহকে কেউ যেন একটা জাল বিছিয়ে আড়াল করে রেখেছে আর সেই জালের ফাঁক দিয়ে দিয়ে আলোর প্রবাহ যেন এক-একটি তারা হয়ে ফুটে উঠেছে। আকাশের এমন আশ্চর্য রূপ আমি আর দেখিনি।

চমৎকার ঠাণ্ডা রাত। ঝিরঝিরে হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম। নারীর মত রাত্রির আলিঙ্গনে সঁপে দিলাম নিজেকে। সাধ যায় কোথাও শুয়ে পড়ি, নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি তারকাখচিত আকাশের দিকে।

কিন্তু শুই কোথায়! সারা ডেকে চেয়ার পাতা, সেগুলো আবার প্যাটাতনের সঙ্গে আটকান। এই বিশাল নির্জন ডেকে এমন একটুও জায়গা নেই যেখানে স্বপ্নের মুহূর্ত যাপন করা যায়। খানিকটা ঘুম, আর খানিকটা স্বপ্ন—এইটুকুই শুধু কাম্য, কিন্তু তাই বলে এই মায়াবী পরিবেশ ছেড়ে নিজের কফিনকেবিনে ফিরতেও মন আমার নারাজ।

এগোতেই দেখি পায়ের কাছে পাকান দড়ির স্তূপ। তার

ওপরেই বসে পড়লাম। চোখ বুজলাম। রাত্রির নেশায় পেয়ে বসল। সমস্ত অনুভূতি ঝিমিয়ে এল।

তারপর, চৈতন্যের সীমান্ত পেরিয়ে গেলাম একসময়।

একটা শব্দ শুনছি যেন! কিন্তু, একি আমারি হৃৎস্পন্দন, না, জাহাজের যান্ত্রিক হৃদয়ের? জানি না। ক্রমেই যেন হারিয়ে যাচ্ছি—হারিয়ে যাচ্ছি—মধ্যরাত্রির মায়াবী পরিবেশে নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলছি।

হঠাৎ পাশে শুকনো কাশির শব্দে চমক ভাঙল। চোখে তখনো আমার অন্ধকার জড়িয়ে, তবু তাকালাম—চশমার অনুজ্জ্বল দুই কাচের ঈষৎ ঝিকিমিকি, আর তারই নিচে একটুকরো অঙ্গার। এ আগুন পাইপের ছাড়া আর কিছুর হতে পারে না। এখানে বসবার সময় আমার দৃষ্টি ছিল আকাশ ও সমুদ্রে তন্ময়, তাই এই সহযাত্রীটিকে দেখতে পাইনি। আগে থেকেই নিশ্চয় উনি এখানে ছিলেন, নিশ্চল হয়ে বসে ছিলেন।

জার্মান ভাষায় সবিনয়ে আমি মাপ চাইলাম, কিছু মনে করবেন না—।

কিস্‌স্যু না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, বলার ভঙ্গিতে অকৃত্রিম জার্মান টান।

অন্ধকার চারদিক। অপরিচিত দুজনে পাশাপাশি বসে। বেশ বুঝতে পারছি, আমার মত অবাক চোখে তিনিও তাকিয়ে আছেন আমারি দিকে। কিন্তু ধূসর অন্ধকারের পটভূমিকায় নিছক একটি ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছুই কারো নজরে পড়ছে না। আমি শুধু তাঁর অস্পষ্ট নিশ্বাসপতনের শব্দ শুনছি, আর পাইপের হঠাৎ-দীপ্তি ঝিলিক দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

এ স্তব্ধতা অসহ্য। ভাবলাম, উঠে যাই। কিন্তু কিছু না বলে এভাবে উঠে যাওয়াটাও তো অভদ্রতা!

কি করবো ভেবে না পেয়ে আমি সিগারেট বের করলাম, দেশ্লাই জ্বাললাম। দেশ্লাই-এর ক্ষণিক আলোয় আমরা দেখলাম পরস্পরকে। একেবারে অচেনা মুখ, খাবার ঘরে বা ডেকে আগে এঁকে কখনো দেখিনি—সারা মুখে দুর্ভাগ্যের ছাপ, ক্রূরতার ছায়া। ভালো করে দেখবার আগেই দেশ্লাই-এর কাঠি নিভে গেল।

আবার সেই অন্ধকার।

আর পাইপের হঠাৎ-দীপ্তির ঝিলিক।

আর একজোড়া ঝকঝকে চশমার কাচ!

চুপচাপ দুজনেই। শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়ালাম।

গুডনাইট।

গুডনাইট! কাটখোট্টা কর্কশ জবাব।

ডেকের সামনের দিকে চলে এসেছি পিছনে অসংলগ্ন পদশব্দ শুনলাম। তিনিই অনুসরণ করছেন। খুব কাছাকাছি এলেন না, তবু দূর থেকেই তাঁর উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি টের পেলাম।

হঠাৎ দ্রুতস্বরে তিনি বলতে লাগলেন, আপনার কাছে যদি কোন সাহায্য চাই, আশা করি কিছু মনে করবেন না? মানে, আমার—একটু ইতস্তত করলেন, মানে আমার জাহাজে এভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখার একটু কারণ আছে।·········মৃত্যুশোক! ···হ্যাঁ, তা বলতেও পারেন। এই জন্যেই এখানে কারো সাথে আমি মিশি না। আপনি নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? আমি চাই ·········মানে, আপনি যে আমায় দেখেছেন একথা যদি কাউকে না বলেন তো অত্যন্ত বাধিত হব। মানে, আমি— তিনি থামলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হবে। এ জাহাজে যে আমার বন্ধু বলতে কেউ নেই—সেকথাও তাঁকে জানালাম। তারপর করমর্দন করে আমি ফিরে গেলাম আমার কেবিনে—বাকি রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটাবার জন্যে। কিন্তু, ঘুমেও স্বস্তি এল না, রাতভোর দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছিলাম। এই রহস্যময় সহযাত্রীটি সম্পর্কে কাউকেই কিছু বলিনি।

কিন্তু নিজেরি কেমন কৌতূহল হল। ডেকে এসে প্রত্যেকটি যাত্রীর মুখের দিকে তাকাই, যদি তাঁর কথা কেউ জানে। মালপত্রের তালিকার ওপর চোখ বুলোই, তাঁর সঙ্গে খাপ খায় এমন কোন নাম যদি চোখে পড়ে। রাত্রির আশায় সারাটা দিন ছটফট করলাম। আশা হল, রাত্রে হয়ত আবার তাঁর দেখা পাব।

জটিল মনস্তত্ত্বের ওপর আমার স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে। কোন জটিল চরিত্রের সংস্পর্শে এলে আমার ভেতরে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা জাগে, তার রহস্য ভেদ না করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাইনে। কোন মেয়েকে জয় করার জন্যেও বুঝি মানুষ এতখানি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে না। দিনটা আমার কাছে বড় বেশি দীর্ঘ মনে হল। সন্ধ্যের দিকেই শুতে গেলাম, কারণ আমি তো নিশ্চিত জানি যে ভেতরের তাগিদই আমায় ঠিকসময় জাগিয়ে দেবে।

ঘটলও তাই। গত রাতের মত একই সময়ে ঘুম ভাঙল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, সবে দুটো! তাড়াতাড়ি উঠে ডেকের দিকে পা বাড়ালাম।

আজকের রাতও অবিকল কালকের মত। তেমনি গাঢ়-গভীর অন্ধকার, তেমনি নির্মেঘ আকাশ, আকাশে তারার

মেলা। শুধু আমি আর কালকের মত নেই। চলন্ত জাহাজের ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ আর স্বপ্নের আমেজ নামছে না আমার মনে। রহস্যময় সহযাত্রীটি কি আজও সেখানে বসে আছেন, সেই পাকান দড়ির স্তূপের ওপর? কৌতূহল ঠেলে ওঠে। প্রথমে একটু ইতস্তত করি—তারপর কৌতূহলের হাতেই আত্মসমর্পণ।

জায়গাটার কাছাকাছি যেতেই দেখলাম লাল জ্বলন্ত একটি চোখ—তাঁর পাইপ। আছেন তাহলে!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিছনে ফিরছি, হঠাৎ ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল, দু পা এগিয়ে এল।

আমার কাছে এসে নিষ্প্রাণ ক্ষমা প্রার্থনার সুরে তিনি বললেন, মাপ করবেন, আপনি বোধ হয় নিজের জায়গায় বসতে যাচ্ছিলেন, আমায় দেখে ফিরে যাচ্ছেন। আপনিই বসুন. আমি যাই।

আমি বললাম, না না সেকি! তাঁর অসুবিধে ঘটাচ্ছি ভেবেই বরং আমি চলে যাচ্ছিলাম। তিনিই থাকুন, আমি যাই।

আমার কোন অসুবিধে হবে না। একটু তিক্ত স্বরে তিনি বললেন, বরং কিছুক্ষণের জন্যে, যে একা নই এতেই আমি খুশি। কতদিন মানুষের সাথে কথা বলিনি! মনে হয়, কত বছর! নিজের কেবিনে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনা, কেবিন তো না, কয়েদখানা! যাত্রীরাও অসহ্য। সারাদিন

কী যে তাদের হাসি-ঠাট্টা-বকবকানি! ওদের দেখলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। ওদের বকবকানি আমায় কেবিন পর্যন্ত ধাওয়া করে, কানে আঙুল দিয়ে থাকতে হয়। অবিশ্যি, ওরা হয়ত কিছু বুঝতে পারে না। আর পারলেই বা কি হত? কি করত? একপাল বিদেশী বই তো কিছু নয়!

হঠাৎ নিজেকে তিনি সোজা করে দাঁড় করালেন। বললেন, কিন্তু আপনি হয়ত বিরক্ত হচ্ছেন। সত্যি, এত কথা আমি বলতে চাইনি। মাথা নামিয়ে অভিবাদন জানিয়ে তিনি পাশ ফিরলেন।

আমি বাধা দিলাম, আপনি আমায় মোটেই বিরক্ত করছেন না। বরং এই নিরিবিলিতে আপনার সাথে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। সিগারেট?

সিগারেট ধরাবার জন্যে তিনি দেশলাই জ্বালালেন, এক পলক তাঁর মুখখানি আরেকবার দেখে নিলাম।

কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলবার আগে তিনিও একবার তাকালেন আমার দিকে—একজোড়া চশমার ঝিকিমিকি আমার চোখের ওপর।

কেমন যেন খানিকটা উত্তেজনা বোধ করি। মনে হয়, কোন কাহিনী শোনাবার জন্যে উনি যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু মনের ঠিক সায় পাচ্ছেন না, সাহস হচ্ছে না, তাই পিছিয়ে যাচ্ছেন। শুধু মুহূর্ত কয়েকের স্তব্ধতাই আস্থার

আবহাওয়া তৈরী করতে পারে, পারে তাঁর মনের সমস্ত দ্বিধাসংকোচ ঘুচিয়ে দিতে।

প্রায় মুখোমুখি হয়ে আমরা দুজনে সেই দড়ির স্তূপের ওপর বসলাম।

তিনি যে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে—হাতের সিগারেটটা কাঁপছে।

দুজনেই সিগারেট টানছি, নীরব দুজনেই।

অবেশেষে তিনিই নীরবতা ভাঙলেন।

আপনি কি ক্লান্ত ?

মোটেই না !

আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। একটু ইতস্তত করলেন, হ্যাঁ, স্পষ্টই বলি,—অবিশ্যি জানি, একজন অচেনা অজানা ভদ্রলোকের কাছে এরকম ছেলেমানুষির কোন মানে হয় না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। আর আমি সইতে পারছি না! এখন হয় কারো কাছে আমায় সব খুলে বলতে হবে, নয়—আত্মহত্যা ! আপনি আমায় কোন রকম সাহায্যই করতে পারবেন না—কিন্তু নিজের দুঃখকে চেপে রাখার যে কী যন্ত্রণা ! আমি—

বাধা দিলাম, আগে থেকে আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া অর্থহীন। বিশেষ করে ঘটনার কিছুই যখন আমি জানিনে। তবে আমার যথাসাধ্য করব, কথা দিচ্ছি। কেউ বিপদে

পড়লে তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য।
অন্তত সাহায্যের চেষ্টা করা তো নিশ্চয় উচিত।

সাহায্য করা কর্তব্য? অন্তত সাহায্যের চেষ্টা? বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য?

প্রশ্নের ভঙ্গিতে আমার কথাগুলিরই অবিকল পুনরুক্তি করলেন তিনি। বিদ্রূপ ও তিক্ততায় মেশানো স্বর।

পরে অবিশ্যি আমি এর অর্থ বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন অবাক হয়ে ভাবলাম—একি পাগল, না মাতাল?

বোধ হয় আমার মনের ভাবটা টের পেয়ে তিনি একটু স্বাভাবিক হয়ে এলেন।

আপনি ভাবছেন আমার মাথায় ছিট আছে, কেমন? না—এখনো আমি রীতিমত সুস্থ আছি। শুধু আপনার একটি কথায় আমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম—কর্তব্য! ওটা একেবারে আমার প্রাণে গিয়ে ঘা দিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন? এই কর্তব্যের প্রশ্নেই এতদিন আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। কর্তব্য! কর্তব্য!

মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। বৃথা ভূমিকা না করে সরাসরি বলতে লাগলেন—

প্রথমেই বলে রাখি, আমি ডাক্তার। আমার কাহিনীর এটাই সবচেয়ে বড় কথা। ডাক্তারী ব্যবসা করতে গিয়ে মানুষকে এমন অনেক কেসের ভার নিতে হয় যেখানে কর্তব্যের সংজ্ঞাটা আপনার মত সরল নয়। এমন অনেক অভাবিত কেস আসে, সাধারণ কর্তব্যবোধ দিয়ে যার কোন সমাধান হয় না। পরস্পর-বিরোধী কর্তব্য সেখানে দেখা দেয়। একটি লৌকিক কর্তব্য, আরেকটি হয়ত বিজ্ঞানের।

বিপদে পড়লে মানুষকে সাহায্য করার কথা বলছিলেন, না? নিশ্চয়, প্রত্যেকেরই তা করা উচিত। সেইখানেই তো মনুষ্যত্বের পরিচয়। কিন্তু ওটা হল গিয়ে নিছক বইয়ের কথা। বাস্তবে কতখানি তা সম্ভব?

এই ধরুন না, হঠাৎ আপনি এখানে এলেন, আগে আপনি আমায় কখনো দেখেননি. আপনার ওপরও কোন দাবি আমার নেই, তবু আপনাকে অনুরোধ জানালাম,—আমায় যে দেখেছেন একথা কাউকে বলবেন না। আপনি হয়ত কাউকেই বললেন না, কারণ আপনি ভাবলেন, অনুরোধ অনুযায়ী

আমায় সাহায্য করা আপনার কর্তব্য। তারপর ফের আপনি এলেন এবং আমি বললাম, দয়া করে আমার কথাগুলি শুনুন, নইলে এ গোপনতা আমার হৃদয় কুরে কুরে খাচ্ছে। আপনি যারপরনাই ভালো মানুষ, সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু এসব হল নিতান্তই সহজ সরল কর্তব্য। দুরূহ কিছু আপনার কাছ থেকে আমি প্রার্থনা করিনি।

কিন্তু ধরুন, যদি আমি বলতাম, আমায় তুলে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিন! তাহলে? তখনো কি আপনি মনে করতেন যে আমায় সাহায্য করা আপনার কর্তব্য? বলুন? জবাব দিন?

আসলে, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। মানুষের নিজের স্বার্থে বা অপরের স্বার্থে কর্তবেরও সীমা নির্ধারণ হয়। নাকি, ডাক্তারের বেলায় কোন সীমারেখার বালাই নেই? ডাক্তারী ডিপ্লোমা পেয়েছে বলেই তাকে পৃথিবীর পরিত্রাতা হতে হবে? কেউ তার কাছে সাহায্য কি দয়া ভিক্ষে করল বলেই কি ডাক্তার নিজের লাভালাভের দিকেও চাইবে না?

আসলে, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্যেরও একটা সীমা আছে, এবং এই সীমা পর্যন্তই সে যেতে পারে।

হঠাৎ তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন।

উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, মাপ করবেন। না না, মাতাল

আমি নই, অন্তত এখনো হইনি। অবিশ্যি, জাহাজে এসে বেপরোয়া মদ খাচ্ছি। মদ অবিশ্যি আগেও খেতাম—কেননা, প্রাচ্যদেশে এসে জীবনটাই আমার ভয়ানক রকমের নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সাত সাতটা বছর ধরে আমি শুধু নেটিভ আর জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে বাস করছি—ভাবতে পারেন? এমন অবস্থায় সভ্যভব্য ভাবে আলাপ করতেই লোকে ভুলে যায়। এরপর যদি কখনো স্বজাতির সাথে দুটো কথা বলবার একটু সুযোগ আসে, জিবের তখন আর লাগাম থাকে না।

হ্যাঁ, আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, একটি সমস্যা আপনার সামনে তুলে ধরব—আচ্ছা, যে-কোন পরিবেশে সাহায্য করাটাই কি মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য? কিন্তু, না, ঠিক হল না। ব্যাপারটা খুলে বলতে একটু সময় লাগবে। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?

একটুও না।

পিছনে অন্ধকারের মধ্যে কি যেন তিনি হাতড়াতে লাগলেন। টুংটাং শব্দ শুনলাম—বোতলে বোতলে ঠোকাঠুকির শব্দ। একটি বোতল থেকে গেলাসে খানিকটা ঢেলে আমার হাতে তুলে দিলেন - বড় এক পেগ হুইস্কি।

চলে তো?

নিশ্চয়। তাল রাখার জন্যে আমি একবার চুমুক দিলাম।

ওদিকে গেলাসের অভাবে বোতলটাই তিনি মুখে চেপে ধরেছেন।

কিছুক্ষণের জন্যে সব চুপচাপ।

জাহাজের ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। অর্থাৎ রাত আড়াইটে।

হ্যাঁ, এবার আপনার কাছে আমি একটি সমস্যা তুলে ধরছি। মনে করুন, কোন এক ডাক্তার ছোট্ট একটি শহরে প্র্যাক্‌টিস করেন। না, সেটাকে শহর না বলে গ্রাম বলাই উচিত। সেই ডাক্তার—

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, ইতস্তত: করলেন একটু, তারপর নতুনভাবে শুরু করলেন।

উঁহু, এভাবে ঠিক হবে না। আমার বেলা ঘটনাটা যেমনটি ঘটেছিল অবিকল তাই আপনাকে বলি। নিজের জবানীতেই বলব, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, নইলে আপনি বুঝতে পারবেন না। অনর্থক লজ্জা, বা গোপনতার আশ্রয় নেয়া ঠিক না। একদা এক ডাক্তারের জীবনে এইসব ঘটেছিল—এভাবে কাহিনী বলে আমার কোন লাভ নেই। মনে করুন, আপনি ডাক্তার, আমি রুগী—রুগীর মত সবকিছু আপনার কাছে আমি খোলাখুলি বলতে চাই।

যাহোক—সেই ভয়ঙ্কর জায়গায় থাকতে থাকতে সভ্যতার

সব রীতিনীতি আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সেই প্রাণঘাতী নির্জনতা আমার হৃদয়ের টুঁটি টিপে সমস্ত জীবনীরস নিঃশেষিত করে ফেলেছিল—

সম্ভবত আমি একটু প্রতিবাদের ভঙ্গি করেছিলাম, কেননা আচমকা তিনি প্রসঙ্গ বদলালেন।

ও, বুঝেছি! আপনি এই প্রাচ্যের এক রূপমুগ্ধ ভক্ত। এর মন্দিরশ্রেণী আর নারিকেলবীথি আপনার মন মজিয়েছে। অবিশ্যি প্রথম দর্শনে, কিম্বা রেলে মোটরে কি রিক্সায় করে যেতে যেতে এখানকার দৃশ্যগুলো ভালোই লাগে। বছর সাতেক আমারও লাগত। মনে তখন আমার কত আশা কত স্বপ্ন—নেটিভদের ভাষা শিখব, এদেশের রোগ-ব্যাধি নিয়ে গবেষণা করব, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কোন অবদান রেখে যাব, আদিবাসীদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হব, সভ্যতার মশাল তুলে ধরব—ইত্যাদি।

কিন্তু এখানকার জীবনযাত্রা অদৃশ্য এক অগ্নিকুণ্ডে বাসের শামিল। মানুষের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা তা শুষে নেয়। রোজ আপনি নিয়মিত কুইনিন খেয়ে যান, তবু আপনাকে জ্বরে ধরবে। এবং এই জ্বর আপনার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্যকে খতম করে ফেলবে, আপনাকে অলস অথর্ব মেরুদণ্ডহীন এক কেঁচো করে ছেড়ে দেবে। ইউরোপীয়দের জীবন হয়ে ওঠে আরো দুর্বিসহ। তাই কেউ ধরে মদ, কেউ আফিঙ, কেউ

চণ্ড, আর বাদ বাকি সবাই মেতে ওঠে নৃশংসতায়। কেউবা হয়ে পড়ে প্রচণ্ড রকমের ধর্ষকামী, বা অন্য কিছু—এককথায়, অখণ্ড জীবনযাত্রার পথ থেকে সকলেই ছিটকে পড়ে।

তখন দেশের জন্যে প্রাণ কাঁদে—দু'পাশে সুবিন্যস্ত অট্টালিকা, মাঝখান দিয়ে পিচমোড়া পথ, আর সেই পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া! আঃ! বা, সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ নরনারীর উষ্ণ সান্নিধ্য! বৃথাই এসবের জন্যে মন গুমরে মরে। এদিকে দিনের পর দিন যায়, বছরের পর বছর—সমস্ত কামনা বাসনা নিরুপায় ব্যর্থতায় বুকে মাথা কোটে।

এর পর কেউ যদি দেশে যাবার দীর্ঘ ছুটিও পায়—কোন উৎসাহই তার জাগে না। তখন হয়ত ওই ছুটি উপভোগের মনটাই তার মরে গেছে। সে জানে, সবাই এতদিনে ভুলে গেছে তার কথা, দেশে তার মুখ চেয়ে কেউ বসে নেই, হয়ত সে গেলে কেউ ফিরেও চাইবে না। অগত্যা এই জলাজঙ্গলের রাজ্যেই সে কাটিয়ে দেয় বাকিটা জীবন।

যেদিন এদেশে আমি চাকরী নিয়ে এলাম সেই দিনটাই আমার জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক। ট্রাজেডির সূত্রপাত সেইদিন।

জন্ম আমার জার্মানীতে। সেখানেই ডাক্তারী পড়ি, পাশও

করি। তারপর লাইপজিগ হাসপাতালে একটা কাজ পাই। এ সময়কার চিকিৎসাবিষয়ক পুরনো পত্র-পত্রিকাগুলি ঘাঁটলে দেখতে পাবেন, কয়েকটি রোগের নতুন এক চিকিৎসাপ্রণালী আমি উদ্ভাবন করেছিলাম এবং তা নিয়ে খানিকটা হৈচৈও হয়েছিল। আমার নাম তখন অনেকেই জানত।

এরপর এক প্রেমের কাহিনী। এতেই আমার ভবিষ্যৎ মাটি হয়ে গেল। মেয়েটির সাথে পরিচয় হয় হাসপাতালে। তার জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম।

নিজের সম্বন্ধে মেয়েটির একটা গোপন গর্ব ছিল, আর সেটাই আমার আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশি। তার জন্যে আমি সর্বস্ব খোয়ালাম। শেষ পর্যন্ত তার জন্যেই হাসপাতালের তহবিল থেকে কিছু টাকাও সরালাম। বলা বাহুল্য, পরে এটা জানাজানি হয়ে যায়। আমার এক কাকা তহবিলের ঘাটতি পূরণ করলেন বটে কিন্তু লাইপজিগ হাসপাতাল থেকে আমায় পাততাড়ি গুটোতে হল।

এই সময় খোঁজ পেলাম, উপনিবেশে চাকরীর জন্যে ওলন্দাজ সরকার ডাক্তার খুঁজছেন। জার্মানদেরও তাঁরা চাকরী দেবেন, মাইনেও মন্দ না।

আমার তখন ভাববার অবসর নেই। আমি সোজা রোটারডাম চলে এলাম। দশ বছরের এক চুক্তিপত্রে সই করে কড়্কড়ে একগোছা ব্যাঙ্ক নোট পকেটে পুরলাম। তারপর তার থেকে

অর্ধেক পাঠিয়ে দিলাম কাকাকে, বাকিটা পেল সেই শহরেরই একটি মেয়ে। কারণ, যে মেয়েটি আমার অধঃপতনের হেতু তার সাথে আশ্চর্য মিল ছিল এই মেয়েটির।

প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় ইউরোপ ছাড়লাম। মনে তখন আমার কোন মোহ দুঃখের লেশমাত্র নেই। জাহাজ বন্দর ছাড়ল, ডেকে বসে বসে আমি স্বপ্ন দেখছি—নতুন এক আকাশের তলে দিগন্তবিস্তৃত নারিকেলসারির, আর জনর্নির্জন অরণ্যানীর, আর অপরিসীম প্রশান্তির !

কর্তৃপক্ষ আমায় সুরাভায়া বা বাতাভিয়ায় পোষ্ট করলেন না, আমায় পাঠালেন—যাকগে, নামটা না হয় নাই শুনলেন।

সুরাভায়া বা বাতাভিয়া বেশ বড় শহর, সেখানে শ্বেতাঙ্গদের সাহচর্য পাওয়া যায়, ক্লাব আছে, আছে গলফ কোর্স, খুশিমত বই মেলে, প্রয়োজন মত সংবাদপত্র। কিন্তু আমি যেখানে গেলাম সে-এক পাণ্ডববর্জিত দেশ, তার সব চেয়ে কাছের শহরটিও একদিনের পথ। দু তিনজন উজবুক অফিসার আর জনাকয়েক সঙ্কর নিয়ে সেখানকার সোসাইটী। দুর্ভেদ্য অরণ্য রবার বাগান আর জলাজঙ্গল চারপাশ থেকে চেপে রেখেছে এলাকাটাকে।

তবু, প্রথম প্রথম ভালোই লাগল। নতুনত্বের একটা আকর্ষণ আছে তো।

পড়াশোনা করে সময় কাটাতে লাগলাম। একদিন ভাইস-

রেসিডেন্ট মহোদয় সফরে বেরিয়ে মোটর দুর্ঘটনায় পড়লেন। পা ভেঙেছে, অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, অথচ ধারেকাছে দ্বিতীয় কোন ডাক্তার নেই। অতএব আমিই হাত লাগালাম। ভদ্রলোক অচিরাৎ সুস্থ হয়ে উঠে বেশ মোটা কিছু দক্ষিণা দিয়ে চলে গেলেন।

সময় কাটানোর জন্যে আদিবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র এবং যেসব বিষ তারা অস্ত্রাদিতে ব্যবহার করে তাই নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করলাম। সময় কাটতে লাগল। অবিশ্যি ইউরোপ থেকে আমি যে প্রাণশক্তি নিয়ে এসেছিলাম সেটা যতদিন ছিল ততদিনই চলল এইসব কাজকর্ম। কিন্তু সেটা নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় পরিবেশ আমায় চেপে ধরল। এখানকার শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গ তো রীতিমত বিরক্তিকর। তাদের এড়িয়ে আমি বেছে নিলাম মদের গেলাস। দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ডুবে গেলাম মদে। যাই হোক না, আর তো মাত্র দুটি বছর। বছর দুয়েক চোখ বুজে কাটিয়ে দিতে পারলেই চুক্তির মেয়াদ খতম হবে, পেন্সন নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারব ইউরোপে গিয়ে। শুধু কোনমতে সেই সুদিনটির জন্যে চোখ বুজে প্রতীক্ষা করা।

প্রতীক্ষাই আমি করছিলাম, কিন্তু ঠিক এই সময়ে অভাবিত ভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল। সেই ঘটনার কথাই আপনাকে বলতে যাচ্ছি। তিনি থামলেন।

স্তব্ধ রাত্রি। জাহাজের বাষ্প-নির্গমনের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। দূর থেকে কানে আসছে তার যান্ত্রিক হৃদস্পন্দন।

ভাবলাম, একটা সিগারেট ধরাই। কিন্তু নড়াচড়া করলে, বা, হঠাৎ দেশ্লাই জ্বাললে উনি হয়ত চমকে উঠবেন। অতএব থাক সিগারেট।

একেকবার মনে হয়, এ স্তব্ধতা বুঝি ভাঙবার নয়। তবে কি উনি মন বদলেছেন? ভেবেছেন, আর কিছু আমায় বলা ঠিক হবে না?

জাহাজের ঘড়িতে ছটা বাজল। রাত তিনটে।

হঠাৎ তিনি সোজা হয়ে বসলেন। টুংটাং শব্দ হল, হুইস্কির বোতলটা মুখে তুলে নিলেন। নতুন প্রেরণা নিয়ে নতুনতর উৎসাহে ফের শুরু করলেন।

হ্যাঁ, এইভাবেই আমার দিন কাটতে লাগল।

জালবদ্ধ মাকড়সার মত মাসের পর মাস একান্ত নিষ্ক্রিয় ভাবে সেই জঘন্য জায়গাটায় আমি চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম। বর্ষা এল, গেল। সারাদিন ধরে ছাদের ওপর বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শুনতাম, কিন্তু কোন মানুষের, অর্থাৎ কোন শ্বেতাঙ্গের সাক্ষাৎ মিলল না একটি দিনের জন্যেও।

শুধু কয়েকটা নেটিভ চাকর আর হুইস্কির বোতল ছাড়া আমার কোন সঙ্গী—সাথী নেই। একদিন কি-একটা বইয়ে আলোক-উজ্জ্বল রাজপথ আর শ্বেতাঙ্গ নারীদের কাহিনী পড়তে পড়তে থরথর ক'রে আমার হাত কাঁপতে লাগল, সমস্ত মন হাহাকার করে উঠল।

আপনি নিছক ভূপর্যটক, তাই এদেশটা যে কী ভয়ানক তা আপনি বুঝতে পারবেন না, যারা এখানে কখনো বাস করেনি তারাও বুঝবে না। মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আমি সময় কাটাতাম, সম্ভব-অসম্ভব নানা সফরের স্বপ্নে মনকে মশগুল করে রাখতাম সবসময়।

এইভাবে একদিন মশগুল হয়ে আছি, চাকর এসে জানাল এক শ্বেতাঙ্গিনী আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী। চাকরটার চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ।

শ্বেতাঙ্গিনী! শ্বেতাঙ্গিনী আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী? বিস্মিত আমিও বড় কম হইনি। কই, কোন ঘোড়ার গাড়ি বা মোটরের শব্দ তো শুনিনি? এই জলাজঙ্গলের রাজ্যে কি করে তবে মেয়েটি এল?

দোতালার বারান্দায় বসেছিলাম। পোশাক-আশাকও এমন নয় যে কোন শ্বেতাঙ্গ নারীর সামনে বের হতে পারি। দুয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজের বেশবাশ ঠিকঠাক করে নিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কেমন যেন একটা অস্বস্তি জাগল। রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়লাম। এই নির্বান্ধব দেশে এমন কে আছে যে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে পারে? এই জঙ্গলের মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গিনী!

মেয়েটি বৈঠকখানায় বসেছিল, তার পিছনে দাঁড়িয়ে একটি চীনা ছেলে—ওরই চাকর নিঃসন্দেহে।

আমায় দেখেই ও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ওর মুখখানি আমি দেখতে পেলাম না। কালো ওড়নার আড়ালে তা আমার অলক্ষ্য রইল।

প্রথমে ও-ই কথা শুরু করল, 'গুডমর্ণিং, ডাক্তার! আগে থেকে না জানিয়ে এসে পড়েছি বলে মাপ করবেন। খুব কি

অসুবিধে করলাম্?'

চোস্ত ইংরেজীতে ও বললে। ভঙ্গি অত্যন্ত দ্রুত। মনে হল, অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে যেন এই কথাগুলিরই মহড়া দিয়েছে।

'গাড়িতে করে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল আপনিও তো এখানেই থাকেন।'

ধাঁধাঁ লাগল। গাড়ি নিয়েই যদি বেরিয়েছিল তবে আমার বাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে এল না কেন?

'আপনার কত প্রশংসাই যে শুনেছি! মোটর এ্যাকসিডেণ্টে আহত ভাইস-রেসিডেণ্টের ব্যাপারে আপনি সত্যিই বাহাদুরী দেখিয়েছেন। সেদিন তাঁকে দেখলাম, আগের মতই বেপরোয়া গলফ খেলছেন। ওখানে প্রত্যেকের মুখে আপনার নাম, আমাদের অথর্ব সিনিয়র সার্জেন আর তাঁর এ্যাসিটেণ্ট দুটোর বদলে শুধু আপনাকে পেলেই আমরা কী খুশিই যে হতাম! যাক সে কথা, আপনি শহরে আসেন না কেন বলুন তো? এখানে কি যোগাভ্যাস করেছেন নাকি?'

একনাগাড়ে ও কথা বলে যায়—আমাকে হাঁ-না করবার সুযোগটুকু পর্যন্ত না দিয়ে।

বুঝতে পারছি, বড় বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে বলেই ওর এই বাকচাপল্য। আর এটা বোঝার সাথে সাথে আমিও যেন আরও নার্ভাস হয়ে পড়ি।

কী খালি বকবক করছে! অবাক আমি। আগে নিজের পরিচয়টা দেয় না কেন? মুখ থেকে ওড়নাটাই বা কেন সরায় না? জ্বরজ্বারি কিছু হয়েছে, নাকি পাগল?

ক্রমে আমারো বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পেতে থাকে, চুপচাপ বোকা বনে দাঁড়িয়ে থাকি—ওদিকে বকবক চলেছে তো চলেইছে।

অবশেষে ওর দম ফুরিয়ে যেতে আমি আহ্বান জানালাম ওপরে আসবার জন্যে।

সঙ্গের ছোকরাটিকে ইশারায় নিচে অপেক্ষা করতে বলে তরতর করে ও আমার আগে আগে ওপরের সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

'ভারী চমৎকার ঘরটি তো!' ঘরে ঢুকেই চারপাশে চোখ বুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'ওঃ কত্ত বই! বই পড়তে কী আরাম!' বইয়ের আলমারির দিকে এগিয়ে গিয়ে নাম-গুলো পড়তে লাগল। এই প্রথম কিছুক্ষণের জন্যে মুখ বুজল।

'চা দিতে বলব?' সবিনয়ে আমি জিজ্ঞেস করি।

আমার দিকে না ফিরেই বলল, 'না, ধন্যবাদ। আমার সময় বেশি নেই। আরেঃ, ফ্লবেরের 'এডুকেশন সেন্টিমেণ্টালে'-ও রয়েছে দেখছি। চমৎকার বই! আপনি তাহলে ফরাসিও পড়েন? সত্যি, জার্মানরা ভারী আশ্চর্য জাত। ইশকুলেই আপনারা অনেকগুলো ভাষা শিখতে পারেন। আপনাদের

মত এতগুলো ভাষায় কথা কইতে পারাটা সত্যিই বিস্ময়ের। হ্যাঁ ভালো কথা, জানেন ভাইস-রেসিডেণ্ট তো ওদিকে প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, চিকিৎসার দরকার হলে আপনাকে ছাড়া আর কারুকে তিনি ডাকবেন না। আমাদের সিনিয়র সার্জেনটি কোন কাজের নন। কিন্তু আপনি—হ্যাঁ, আমার মতে, পরামর্শ যদি নিতে হয় তো আপনার কাছ থেকেই—গাড়িতে আসতে আসতে এই কথাটাই হঠাৎ আমার মাথায় এল। আর, এই হল গিয়ে তার উপযুক্ত সময়। কিন্তু,'—আমার দিকে না তাকিয়েই ও কথা বলে যাচ্ছিল, মুখ বইয়ের আলমারিতে—'কিন্তু আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত? তাহলে—আমি না হয় আরেক দিন আসব?'

শেষ পর্যন্ত চলে যাবার জন্যেই এই দীর্ঘ ভূমিকা নাকি আমার অবাক হওয়ার মাত্রা চড়ছে, অবিশ্যি চোখেমুখে সে-ভাব প্রকাশ পেল না।

জানালাম আজই হক কি আরেকদিনই হক, ওঁর সেবার জন্যে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। উনি শুধু নিজের স্থুবিধে অস্থুবিধেটুকু দেখুন।

'যাক, এসেই যখন পড়েছি—', এবার একটু পাশ ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু মুখ আমার দিকে ফেরাল না, আলমারি থেকে একটি বই নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'তেমন গুরুতর কিছু নয় অবিশ্যি। এ ধরনের গোলযোগ

মেয়েদের প্রায়ই হয়। মাথাঘোরা, ফিট হওয়া, বমিবমি ভাব—এই সব আর কি। একটু আগেই মোটরে আসছি, একটা বাঁক ঘোরার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ভাগ্যিশ ছেলেটা সাথে সাথে ধরে ফেললে, নইলে গাড়ি থেকেই গড়িয়ে পড়েছিলাম। ও আমার মুখে-চোখে জল দিতে তবে সুস্থ হই। বোধ হয়, সোফারটা বড্ড জোরে ড্রাইভ করছিল বলেই এমন হল, না? আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার?'

'হুট করে জবাব দেওয়া শক্ত। এরকম ফিট কি আপনার প্রায়ই হয়?'

'উঁহু। ইদানীং হচ্ছে, এই দুয়েক হপ্তা আগে থেকে। সকালের দিকে শরীরটা এত ম্যাজম্যাজ করে!' বলেই বইয়ের আলমারির দিকে পিছন ফিরল, আরেকটি বই টেনে নিয়ে আগের মতই তার পাতা উল্টে যেতে লাগল।

এমন অস্বাভাবিক চালচলন কেন? মুখের ওড়নাটা সরিয়ে কেন তাকাচ্ছে না আমার মুখোমুখি?

ইচ্ছে করেই আমি কোন জবাব দিলাম না, বরং ও যে আমার জবাবের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে আছে সেটা টের পেয়ে মনে মনে খুশিই হলাম। ও যদি এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারে, তবে আমিই বা না করি কেন?

অবশেষে ও ই ফের কথা বলল, পরম নিস্পৃহ একান্ত নিরাসক্ত

স্বর, 'তাহলে, কি বলেন, আপনি রাজী ? ব্যাপারটা তেমন গুরুতর কিছু নয়,—এদেশী রোগগুলোর মত জটিল তো নয়ই—না কি বলেন ? আর বিপদ-আপদও কিচ্ছু নেই।'

'জ্বরজ্বারি আছে কিনা সেটা আগে দেখা দরকার। দেখি আপনার নাড়িটা।'

আমি ওর দিকে এগোলাম। কিন্তু ও আমায় এড়াতে চাইল।

'না না ডাক্তার, জ্বরটর আমার হয়নি। মানে—মানে এই ফিট হবার পর থেকে রোজই আমি নিজের টেম্পারেচার নিচ্ছি কিনা। টেম্পারেচার স্বাভাবিকই আছে। হজমেরও গোলমাল নেই।'

আমি একটু ইতস্তত করলাম। মেয়েটির অস্বাভাবিক চাল-চলন এতক্ষণে রীতিমত সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। নিশ্চয় আমার কাছ থেকে ও কোন সাহায্য চায়। নিছক ফ্লবের নিয়ে আলোচনার জন্যে আর দু'শ মাইল মোটর হাঁকিয়ে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে এসে আমার দ্বারস্থ হয়নি।

আরও মিনিট দুই-তিন চুপচাপ থাকার পর বললাম, 'মাফ করবেন, আপনাকে আমি পষ্টাপষ্টি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'নিশ্চয়, একশোবার। ডাক্তারের কাছে তো লোকে আসেই এই জন্যে।' খানিকটা হাল্কা সুরেই বলল, কিন্তু তার আগেই পুনশ্চ আমার দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, হাতড়াচ্ছে বইয়ের আলমারি।

'আপনার কি কোন সন্তান আছে?'

'হ্যাঁ। একটি মাত্র, ছেলে।'

'আচ্ছা, সেবারে গর্ভাবস্থার প্রথম দিকেও কি আপনার এই-সব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' সুস্পষ্ট জবাব। কণ্ঠস্বরও বদলে গেছে।

'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে—সেই ব্যাপারটাই আবার ঘটেছে?'

'হ্যাঁ।'

একই জবাবের পুনরুক্তি। তেমনি সুস্পষ্ট, তেমনি ধারাল। কনসাল্টিং রুমে দয়া করে একবার আসুন। পরীক্ষা করলেই সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে যাবে।'

এতক্ষণে ও আমার দিকে মুখ ফেরাল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ওড়নার আড়াল থেকেও একজোড়া চোখের দৃষ্টি আমায় এসে বিঁধছে।

'তার কোন দরকার নেই, ডাক্তার। এ ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।'

কিছুক্ষণের নৈস্তব্ধ।

বুঝতে পারলাম, বক্তা বোতল থেকে আরো খানিকটা প্রেরণা সংগ্রহ করে নিচ্ছেন।

তারপর আবার তিনি শুরু করলেন—

আপনি নিজেই ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন। সেই নির্জন একাকীত্বে আমি যখন হাঁফিয়ে উঠেছি—আবির্ভাব হল এক নারীর! দীর্ঘ কয়েক বছর পরে এই প্রথম এক শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। মনে হল, একটা অশুভ বিপজ্জনক কিছুর আবির্ভাব ঘটেছে আমার ঘরে। ওর সংকল্প শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল।

প্রথমে ভেবেছিলাম নেহাৎ আলাপ-পরিচয় করবার জন্যেই ওর আগমন। তারপর, হঠাৎ ওই প্রস্তাব শুনে মনে হল, আমার মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। কেননা, ওর বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। অবিশ্যি কোন মেয়ের মুখ থেকে এধরণের প্রার্থনা এই প্রথম আমি শুনছি না। কিন্তু তারা আসত অন্যভাবে, কেঁদে-কঁকিয়ে অনুরোধ জানাত বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে। কিন্তু এই মেয়েটি আশ্চর্য এক ব্যতিক্রম। বাইরে থেকে মনে হয় ও আমার চেয়েও শক্তিশালী, আমাকে দিয়ে জোর করেই হয়ত নিজের কাজ হাসিল করে নেবে।

কিন্তু ঘরে সত্যিসত্যিই যদি অশুভ কিছুর আবির্ভাব ঘটে থাকে, তা ঘটেছিল আমারই মধ্যে। নিজের মনেই আমি সেটা অনুভব করলাম। তিক্ততায় সারা মন ভরে

গেল, প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালাম—কেন যেন মনে হল, এই মেয়েটি আমার পরম শত্রু।

ইচ্ছে করেই কথা বললাম না কিছুক্ষণ।

বুঝতে পারছি, ওড়নার আড়াল থেকে একজোড়া চোখ আমার ওপর নির্নিমেষ। সে-চোখে চ্যালেঞ্জের ভাষা, সে চায় জোর করে আমায় দিয়ে কথা বলাতে। কিন্তু কথা আমি বললে তো!

শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্যি আমিই আগে মুখ খুললাম। কিন্তু প্রসঙ্গ অন্য। এমন ভাব দেখলাম যেন ওর চালচলন, মনের কথা কিছুই আমি বুঝিনি। পষ্টাপষ্টি সব ও স্বীকার করছে না কেন? আকার ইঙ্গিতে যে কাজ সারবে সেটি হবে না। এই একই কাজের জন্যে অন্যেরা যেমন করে আমার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ত, ও-ও আগে তেমনি পড়ুক, তারপর দেখা যাবে।

বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনায় মগ্ন হলাম। বললাম, এসব উপসর্গ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন কারণ নেই, গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে সব মেয়েরেই এমন হয়ে থাকে, এটাকে বরং স্বাস্থ্যের লক্ষণই বলা যায়। প্রসঙ্গত নিজের জানা ও বইয়ে-পড়া একাধিক ঘটনার কথাও উল্লেখ করলাম।

অর্থাৎ আসল ব্যাপারটাকে নিছক এক ডাক্তারী আলোচনার গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখলাম। কথার পর কথা সাজিয়ে যাচ্ছি,

যতক্ষণ না ও আমায় বাধা দেয়, থামব না। এবং আমায় বাধা না দিয়েও ওর উপায় নেই—কতক্ষণ আর মুখ বুজে আমার বকবকানি শুনবে ?

সত্যি এক সময় বাধা দিল। শুধু হাতখানি একবার শূন্যে আন্দোলিত করেই আমার কথাগুলোকে যেন উড়িয়ে দিল হাওয়ায়।

'এর জন্যে আমি মোটেই ভাবছি নে, ডাক্তার। তবে, আগের মত এবার সুস্থ নই। বুকে যন্ত্রণা—'

'বুকে যন্ত্রণা!' যেন চমকে উঠলাম, চোখেমুখে রীতিমত উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়ে বললাম, 'তাহলে তো বুকটা একবার পরীক্ষা করতে হয়।'

ষ্টেথেস্‌কোপটার জন্যে পিছন ফিরছি, বাধা দিল।

এবার কথার ধরনই বদলে গেল। সুস্পষ্ট আদেশের সুর, 'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন—সত্যি বুকে আমার কোন রোগ নেই। পরীক্ষার নামে আপনার বা আমার বৃথা সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। আশা করি, আমার এ কথাটার ওপর আপনি গুরুত্ব দেবেন—আপনাকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছি।'

এ যে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণার শামিল! হাতের দস্তানা খুলে ছুঁড়ে ফেলল, তাড়াতাড়ি আমি সেটা কুড়িয়ে নিলাম।

'বেশ, বিশ্বাসই যদি করে থাকেন তবে খোলাখুলি

সব বলুন। কিন্তু তার আগে দয়া করে মুখ থেকে ওড়নাটি সরান, এখানে এসে বসুন। বইপত্তর আপাতত থাক, নিজের কথা বলুন। ডাক্তারের কাছে এসে কেউ ওড়নায় মুখ ঢেকে থাকে না।'

আমার কথা শুনল। সামনে এসে বসল, ওড়নাও খুলে ফেলল।

মুখ দেখলাম।

আর দুর্বোধ্য এক আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল আমার সারা শরীরে।

ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে এমন এক ধরনের আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে বয়েসের বলিরেখা কোনদিন যেখানে কলঙ্কের ছাপ ফেলতে পারে না। কিন্তু এর বয়েস এখনো অনেক কম, আত্মবিশ্বাসে স্থির ধূসর দুই চোখ—আর অতলস্পর্শ কামনার ইশারা সে চোখের তারায় তারায়। ঠোঁট চাপা, ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটি কথা মুখ থেকে বার করে সাধ্য কার!

প্রায় মিনিটখানেক আমরা পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম। শেষ পর্যন্ত আমাকেই আগে চোখ নামিয়ে নিতে হল—ওই ভাবলেশহীন ঠাণ্ডা নিষ্ঠুর চোখে চোখ রাখার শক্তি আমার রইল না।

কিন্তু, সত্যিই কি ভাবলেশহীন? জিজ্ঞাসার চাপা বিদ্যুৎও কি ঝলকাচ্ছে না?

চৌত্রিশ

হঠাৎ বলল, 'ডাক্তার, আপনার কাছ থেকে যা চাই তা কি বুঝতে পেরেছেন, না—?'

'খানিকটা অনুমান করছি মাত্র। যাক্, পষ্টাপষ্টি বলাই ভালো—আপনি বর্তমান অবস্থা থেকে রেহাই পেতে চান, কেমন? আপনি চান এই ফিট, বমি এবং মাথাধরার যা মূল কারণ তা থেকে আপনাকে আমি বাঁচাই—এই তো?'

'হ্যাঁ।' বলির খাঁড়ার মত সুস্পষ্ট উত্তর।

'জানেন, দুজনের পক্ষেই এটা বিপজ্জনক?'

'জানি।'

'এ ধরনের অপারেশন বেআইনী?'

'আমি জানি কোন কোন ক্ষেত্রে এটা নিষিদ্ধ নয়। বরং বলা যায়, অত্যাবশ্যক।'

'হ্যাঁ, তবে সেসব ক্ষেত্রেও ডাক্তারী শাস্ত্রের দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা দরকার।'

'বেশ তো, আপনি অনায়াসে সে রকম একাধিক কারণ বের করতে পারেন। আপনি ডাক্তার!'

মুখোমুখি তাকাল, যেন আদেশ করছে আমায়।

এদিকে ভেতরে ভেতরে আমার কাঁপুনি ধরে গেছে, ওর সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে আমি স্তম্ভিত।

তবু রুখে দাঁড়ালাম। ওকে কিছুতেই বুঝতে দেয়া হবে না যে ও আমার চেয়েও শক্তিধর। কিন্তু না, আবার ছুট

করে কিছু করাও ঠিক না—ধীরে ধীরে জট পাকাতে হবে, ওকে বাধ্য করতে হবে আত্মসমর্পণে।

'ডাক্তাররা সব সময়েই যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পায় না। যাক, তবু এ সম্পর্কে কোন সহকর্মীর সাথে একবার পরামর্শ করে দেখি।'

'আপনার কোন সহকর্মীর প্রয়োজন নেই আমার। আমি এসেছি আপনারই কাছে।'

'কিন্তু আমারই কাছে কেন, জানতে পারি?'

আমার কথার তেমন গুরুত্ব না দিয়ে ও বলল, 'সে কথা বলতে অবিশ্যি আপত্তি নেই। আপনার কাছে এসেছি কারণ আপনি থাকেন লোকালয়ের বাইরে, কারণ আপনি আমায় আগে কখনো দেখেন নি, কারণ, আপনার কৃতিত্ব 'কারণ, ...এই প্রথম একটু ইতস্তত করল,... কারণ...কারণ আপনি হয়ত আর জাভাতেই থাকবেন না, বিশেষত প্রচুর অর্থ নিয়ে যদি দেশে ফেরবার সুযোগ পান।'

বলতে কি, সারা শরীরে আমার বিদ্যুৎ বয়ে গেল। মেয়েটির ব্যবসাদারীতে থ হয়ে গেলাম। চোখের জল নয় কাকুতি-মিনতি নয়—আমায় ও বুঝে নিয়েছে, আগেই আমার দর দাম ঠিক করে ফেলেছে!

চাপা ব্যঙ্গের সুরে বললাম, 'এই যে প্রচুর অর্থের কথা বললেন—এটা নিশ্চয় আপনি দেবেন? তার কারণ—'

'তার কারণ, আপনি আমায় সাহায্য করবেন, তারপর এই

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নেবেন—এই জন্যে।'

'জানেন, এর জন্যে আমার পেন্সন পর্যন্ত মারা যাবে?'

'আমি আপনাকে যে অর্থ দেব তাতে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে আশা করি।'

'এভাবে সরাসরি কথা বলবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু, আমি আরো একটু খোলাখুলি জানতে চাই—কত দেবেন?'

'আমষ্টার্ডমের কোন ব্যাঙ্কের নামে এক লক্ষ গাল্ডেনের একটি ড্রাফট।'

রাগে ও বিস্ময়ে আমি চমকে উঠলাম। ইনি তাহলে সব কিছু ঠিকঠাক করেই এসেছেন! মায় ডাচ সরকারের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের দরুন কি পরিমাণ অর্থ আমায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেবেন তা পর্যন্ত! দেখার আগেই আমায় কিনে রেখেছেন, ধরেই নিয়েছেন যে ওনার কথায় রাজী আমি হবই হব?

ইচ্ছে হল, ওর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিই—এই জঘন্য ব্যবসাদারীতে মনটা আমার এমনই বিগড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যখন উঠে দাঁড়ালাম (ও আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে), ওর গর্বোদ্ধত মুখের দিকে টলমল দুই চোখের দিকে তাকাতেই আমার ভেতরের পশুটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, রক্তে কামনার আগুন জ্বলল।

সাঁইত্রিশ

হয়ত আমার চোখেমুখে তার কিছুটা আভাস ফুটে থাকবে, কেননা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে, বেয়াদব ভিখিরীর দিকে যে চোখে তাকায় মানুষ সেই চোখে ও তাকাল আমার দিকে।
আর মুহূর্তে দুজন দুজনকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম—আমাদের কারো কাছেই সেটা আর নাজানা রইল না।
আমায় ঘৃণা করতে লাগল, কারণ আমায় দিয়ে ও নিছক স্বার্থসিদ্ধি করে নিতে চায়। আর আমার ঘৃণার কারণ হল কাকুতি-মিনতির বদলে ও সাহায্য দাবি করছে কেন?
এই মৌনতার মুহূর্তগুলিতে আমরা যেন পরস্পরের সাথে মন খুলে কথা বলে নিলাম।
হঠাৎ একটা বিষাক্ত সাপ যেন আমায় দংশন করল। কুটিল কুৎসিত একটা চিন্তা মনের মধ্যে হানা দিয়ে গেল—ওকে বললাম···বললাম···
কিন্তু না, বড় তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়ত ভুল বুঝবেন। কি ভাবে আমার মনে এই উদ্দেশ্যের উদ্রেক হল সেটা আগে আপনাকে বুঝিয়ে বলা দরকার।

বক্তা থামলেন।
আরও খানিকটা হুইস্কি।
নতুন উৎসাহে ফের শুরু করলেন—

আটত্রিশ

নিজের সাফাই গাইছি না। কিন্তু আমায় ভুল বুঝবেন তাও অসহ্য। লোকে যাকে ভালো বলে তা আমি নই, কোন দিনই ছিলাম না—তবু যতদূর সম্ভব লোককে সাহায্য করবার ত্রুটি করতাম না। আমার সেখানকার জঘন্য জীবন-যাত্রার একমাত্র আনন্দ ছিল নিজের জীবনের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করা—রোগজীর্ণ মানুষের সামনে নতুন আশার আলো তুলে ধরা।

এও এক ধরনের সৃষ্টির আনন্দ। এর ফলে নিজেকে অনেক সময় ঈশ্বর বলে মনে হয়। হয়ত আমার কাছে কোন নেটিভকে আনা হয়েছে, সাপের কামড়ে পা ফুলে ঢোল, পা কেটে বাদ দেয়া ছাড়া মানুষটাকে বাঁচাবার কোন পথ নেই—কিন্তু আমি পা ও মানুষ দুই বাঁচিয়ে দিলাম। সে যে কী আনন্দ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলা-জঙ্গল ভেঙে গিয়েছি —কি, না এক শয্যাশায়ী নেটিভ রমণীর চিকিৎসার জন্যে। যে ধরনের সাহায্য মেয়েটি চাইছিল, লাইপজিগ হাসপাতালে অমন সাহায্য অনেক মেয়েকেই আমি করেছি, স্বেচ্ছায় করেছি।

কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে অন্তত বোঝা যেত, নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই মেয়েটি এসেছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে, মৃত্যু অথবা জীবনভোর ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে। অন্যের প্রয়োজনই তখন সাহায্যের জন্যে আমায় উন্মুখ করে তুলত।

কিন্তু এই মেয়েটি—কি করে যে এর কথা আপনাকে বোঝাই! ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ যেন এসে পড়েছে—এমনি ভাব দেখিয়ে ও প্রথম যখন সামনে দাঁড়াল, তখনই আমার মন বিরূপ হয়ে যায়। ওর অনমনীয়তাই আমায় বিমুখ করে তোলে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে পশুটা লুকিয়ে আছে ওর চালচলনে সে-ই মাথা তুলে দাঁড়ায়।

আর কী সব ভাবভঙ্গি, যেন এটা জীবন-মরণের কোন সমস্যাই নয়! কী নিরাসক্তি আর নিস্পৃহতা—যেন আমি ওর হুকুমের চাকর!

হয়ত মাস দুতিন আগেই এই অবাঞ্ছিত সন্তানের পিতাকে উন্মাদ কামনায় বুকে টেনে নিয়েছিল—আর আজ মন থেকে সেসব মুছে ফেলে আমার কাছে এসেছে ভ্রূণহত্যার জন্যে!

এই সব চিন্তা আমার মনে পাক খেতে লাগল। ও আমায় হুকুম করে কাজ বাগিয়ে নেবে! আমি তা হতে দেব না, কিছুতেই না—সেই অজানা অদেখা লোকটির মত আমিও ওকে আপনার করে পেতে চাই—তারই মত নিজের পৌরুষ দিয়ে আমিও ওকে বিপর্যস্ত করব। আমার প্রকৃত মনোভাবটা দাঁড়াল এই রকম।

এর আগে কখনও আমি নিজের পেশার সুযোগ নিইনি। সেদিন যে নিলাম তার কারণ কামনা নয়, বা জোরাল যৌন তাগিদও না। ওর দর্প চূর্ণ করবার জন্যেই আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। আমি যে পুরুষ—একটি মেয়েকে হার মানিয়ে সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই আমার এই অস্থিরতা। আগেই বলেছি, বাইরে-থেকে-দেখতে-ঠাণ্ডা-প্রকৃতির মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কেমন একটা দুর্বলতা আছে। এছাড়াও একটি কারণ ছিল—প্রায় সাত বছর কোন শ্বেতাঙ্গ নারীর স্পর্শ পাইনি। নেটিভ মেয়েদের কথা বাদ দিন। যদি কোন 'শ্বেতপ্রভু' তাদের কাউকে শয্যাসঙ্গিনী করতে চায় তো মাত্রাছাড়ান শ্রদ্ধায় সে কাঁপতে শুরু করে দেয়। এমনি আজব জীব তারা। হীনমন্যতায় মাথা সবসময় তাদের নীচু হয়েই আছে—চাওয়া মাত্তর প্রার্থনা মঞ্জুর। এতে কোন স্বাদ থাকে না। আরবী মেয়েদের কথা অবিশ্যি আলাদা, এবং আমার মনে হয়, চীনা ও মালয়ী মেয়েরাও অন্য ধাঁচের। কিন্তু আমি বাস করি জাভা-ললনাদের মধ্যে। অতএব, বুঝতেই পারছেন, এই মেয়েটি আমার মনে কেমন সাড়া তুলেছিল। মেয়ে তো নয়, একটুকরো আগুন! যেমন তেজী তেমনি রহস্যময়। শরীরে আবার সদ্য-শেষ কামোপ-ভোগের স্বাক্ষর!

স্বভাবতই ধরে নিলাম, সহজেই মেয়েটি আমার খাঁচায় এসে

প্রবেশ করবে—যেখানে দীর্ঘ দিনের বুভুক্ষু হিংস্র এক জানোয়ার থাবা উঁচিয়ে আছে।

পরবর্তী ঘটনাগুলি যাতে বুঝতে পারেন তাই এত কথা আপনাকে বলা। এইসব চিন্তাই তখন মাথায় পাক খাচ্ছিল, ক্রমেই উত্তেজিত করে তুলছিল আমায়।

কিন্তু সে-ভাব গোপন করে ঠাণ্ডা স্বরে আমি বললাম, 'একলক্ষ গাল্ডেন ? না, ওতে হবে না।'

ও আমার দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল।

নারীর মন নিয়েই ও বুঝতে পেরেছে যে বাধাটা আসলে অর্থের নয়।

কিন্তু মুখে শুধু বলল, 'আপনি তাহলে কত চান ?'

'নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি কথা বলাই ভালো।' জবাব দিলাম, 'আমি ব্যবসায়ী নই। আপনি আমায় অর্থের কাঙাল মনে করবেন না। আর আমাকে যদি নিছক ব্যবসায়ীই মনে করে থাকেন তাহলে অর্থ দিয়ে আমার দাবি মেটাতে আপনি পারবেন না।'

'আপনি তাহলে একাজ করবেন না ?'

'অর্থের জন্যে অন্তত নয়।'

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। এত স্তব্ধতা যে ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি।

'আপনি কি চান?'

উচ্চস্বরে জবাব দিলাম, 'প্রথমত আমি চাই, ব্যবসায়ী নয়, মানুষ হিসেবে আপনি আমার সাহায্য প্রার্থনা করবেন। মানুষ হিসেবে আপনি সাহায্য চান, মানুষ হিসেবে আপনাকে আমি সাহায্য করব। আমি শুধু ডাক্তার নই। চব্বিশ ঘণ্টাই আমি কিছু ডাক্তারী করি নে—এ ছাড়াও অন্য সময় আছে আমার জীবনে—এবং এমনি কোন সময়ে আপনি আমার কাছে আসবেন।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, 'অর্থাৎ আমি যদি আত্ম-সমর্পণ করি তবেই আপনি একাজ করবেন?'

'না, তা আমি বলতে চাই না। এখনও আপনি সোজা কথায় কেন আসছেন না—আপনাকে মুখ ফুটে আমার সাহায্য ভিক্ষে করতে হবে। আগে তাই করুন, তারপর আমি জবাব দেব।'

তেজিয়ান ঘোড়ার মত মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ও বলল, 'আপনার সাহায্য ভিক্ষে করব না, মরি তাও স্বীকার।'

মাথাটা দপ করে উঠল। কঠোর স্বরে বললাম, 'স্বেচ্ছায় না করলে আমি জোর করব। যাক, এ নিয়ে বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। আপনি জানেন আমি কি চাই। যা চাই দিলেই আপনাকে আমি সাহায্য করব।'

স্থির দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। (সে দৃষ্টির

ভীষণতা কী করে আপনাকে বোঝাব!) তারপর হঠাৎ উত্তেজনার বাঁধ ভেঙে গেল, কলস্বরে হেসে উঠল।

উঃ! সে কী হাসি! মুহূর্তে সে-হাসি যেন এক ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দিল আমাকে, গুঁড়িয়ে গেলাম আমি, তালগোল পাকিয়ে গেল আমার সমস্ত চেতনা। ওর সেই তীক্ষ্ণ তীব্র হাসি সারা মনে দুর্বোধ্য এক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করল। হঠাৎ ইচ্ছে হল, নিজেই নিজের গালে চড় কষাই, ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ি। ওর পায়ের পাতায় একটি চুমু রাখার জন্যে হৃদয় আমার ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ওর প্রাণপ্রাচুর্যের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমি যেন বিদ্যুতের কষাঘাত খেলাম—কিন্তু,

কিন্তু ও ততক্ষণে পিছনে ফিরেছে, দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি যন্ত্রচালিতের মতো আমি পিছু নিলাম, বিড় বিড় করে ক্ষমা চাইতে লাগলাম, মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলামাল হয়ে গেল আমার।

হঠাৎ ও ঘুরে দাঁড়াল। আদেশের স্বরে বলল, 'আমাকে অনুসরণ করবার কিম্বা আমি কে তা জানবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আপসোস করতে হবে!' বলেই ছিটকে বেরিয়ে গেল।

একটু ইতস্তত করে বক্তা আবার শুরু করলেন—

দরজা দিয়ে চকিতে ও অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বিমূঢ় হয়ে। ওর নিষেধাজ্ঞা যেন আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে পদশব্দ। অবশেষে সদর দরজা বন্ধের শব্দ এল।

একবার ভাবলাম অনুসরণ করি। পা সরল না। যেন অবশ হয়ে গেছে সারা শরীর।

মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল।

তারপর, হঠাৎ এক সময় সম্বিৎ ফিরে এল, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলাম।

এখান থেকে শহরে যাবার রাস্তা মাত্র একটি। এই রাস্তা দিয়েই ওকে যেতে হবে। সাইকেলটা বের করে নিয়ে তীরবেগে চালাতে লাগলাম সেই রাস্তা ধরে। মোটরে ওঠার আগেই ধরতে হবে। আমার কথা ওকে বলতেই হবে।

কিছুদূরেই একটা বাঁক, বাঁকের পরে সেটেলমেণ্ট এলাকা। দূর থেকে দেখলাম ও হনহন করে হাঁটছে, পিছনে সেই চীনা

ছেলেটি। আমি দেখার সাথে সাথে ও বুঝতে পারল যে আমি অনুসরণ করছি। কেননা, হঠাৎ থেমে ছেলেটাকে কি যেন বলল, তারপর একাই এগিয়ে গেল, ছেলেটা পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল।

একা গেল কেন? তবে কি নির্জনে আমার সাথে কথা বলতে চায়? সাইকেলের বেগ বাড়িয়ে দিলাম।

ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একেবারে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে সাইকেলশুদ্ধ আমি ছিটকে পড়লাম। ছেলেটাকে গালাগাল দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। থাপ্পর কষাতে গেলাম হারামজাদার গালে, সে টুক করে সরে দাঁড়াল। যাকগে!

কিন্তু ফের যখন সাইকেলে চাপবার চেষ্টা করছি, হারামজাদা আবার এগিয়ে এল। হ্যাণ্ডেলটা মুঠো করে ধরে ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'যাবেন না সাব।'

এসব দেশে আপনি বাস করেন নি। তাই চাকরশ্রেণীর একটা নেটিভের পক্ষে এ ধরনের কাজ যে কী অমার্জনীয় স্পর্ধার পরিচায়ক তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। একটা চীনা জানোয়ারের বাচ্চা আমার মত এক 'শ্বেতপ্রভু'কে বলছে কি না, এগোবেন না, যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন! স্বভাবতই তার কপালে এক ঘুষি বসিয়ে দেয়া ছাড়া এর কোন জবাব নেই।

ছোঁড়া একবার টাল খেল, হ্যাণ্ডেল তবু ছাড়ল না। ছুই চোখে তার ভয়ের বিভীষিকা, কিন্তু মনের জোর অপরিসীম। কিছুতেই আমায় ও যেতে দেবে না।

'যাবেন না সাব।' একই কথার অবিকল পুনরুক্তি।

ওর ভাগ্যি ভালো যে পিস্তলটা আমি সঙ্গে আনিনি। আনলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারতাম হারামজাদাকে।

'আমায় যেতে দে, এ্যাই শুয়ার!' চীৎকার করে উঠলাম।

ভয়বিহ্বল ছুই চোখ তুলে সে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু হুকুম মানল না।

এদিকে বুঝতে পারছি, আর দেরি করলেই ও নাগালের বাইরে চলে যাবে। পাগলের মত ছেলেটার থুতনির ওপর প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলাম। রাস্তার ওপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

সাইকেলে উঠতে গিয়ে দেখি আছাড় খাওয়ার সময় সামনের চাকাটা এমনভাবে বেঁকে গেছে যে চালান অসম্ভব। চাকাটা সোজা করবার বৃথা চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ, তারপর সাইকেলটা রাস্তার পাশে ফেলে রেখেই আমি ছুটতে লাগলাম —উর্ধশ্বাসে।

হ্যাঁ, সত্যি আমি ছুটছিলাম।

এবং এইভাবে ছোটার মানে যে কি তা আপনারা, যারা এইসব দেশে বসবাস করেন নি, ঠিক বুঝতে পারেন না। একজন শ্বেতাঙ্গ তার নিজের কৌলিন্য মানমর্যাদা সব জলাঞ্জলি

দিয়ে অসংখ্য, নেটিভের কৌতূহলী চোখের সামনে ছুটছে—এ দৃশ্য অচিন্ত্যনীয়!

কিন্তু আমি তখন সমস্ত মানমর্যাদার অতীত। উন্মাদের মত ছুটছি। ছুটছি তো ছুটছিই।

পথের দুপাশের কুটির থেকে লোকেরা হাঁ করে দেখছে, তাদের 'ডাক্তার সাহাব', তাদের 'শ্বেতপ্রভু' রাস্তা দিয়ে দৌড়ুচ্ছে সাধারণ এক রিক্‌সাওয়ালার মত! অবাক, অবাক তারা।

সেটেলমেণ্টে গিয়ে যখন পেঁছিলাম, ঘেমে-নেয়ে উঠেছি। 'গাড়িটা কোথায়?' হাঁফাতে হাঁফাতে আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম।

'এই মাত্তর চলে গেল, সাব। জবাব এল।

চারপাশ থেকে সকলে আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে। হয়ত আমাকে পাগলের মতই দেখাচ্ছিল, হয়ত আমার চোখে-মুখে আচারে-ব্যবহারে পোশাকে-আশাকে সেই চিহ্নটা ফুটে উঠেছিল। সামনে তাকিয়ে গাড়ির কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না, শুধু দূরে খানিকটা ধূলোর ঘূর্ণি।—

তাহলে ও সত্যি সত্যি নাগালের বাইরে চলে গেল! আমাকে আটকাবার জন্যেই তবে ছেলেটাকে রেখে গিয়েছিল! ওর উদ্দেশ্যেই শেষপর্যন্ত সফল হল!

কিন্তু ওর আসল উদ্দেশ্য সফল হল না। কারণ এই সব দেশে ইউরোপীয়ের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, তাই তাদের নাড়িনক্ষত্র প্রত্যেকেরই

প্রায় মুখস্থ থাকে। ও যখন আমার সাথে দেখা করতে যায়, শফার এখানে বেশ একটি আড্ডা জমিয়ে তোলে।

অতএব মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমি ওর নামধাম সব জেনে নিলাম। এই ইংরেজ তরুণীটির স্বামী এক বিত্তশালী ওলন্দাজ ব্যবসায়ী। থাকে প্রাদেশিক রাজধানীতে—এখান থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে। মাস পাঁচেক আগে ব্যবসা-সূত্রে ভদ্রলোক আমেরিকায় গিয়েছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর ফিরে আসার কথা। তারপর স্বামী স্ত্রীতে একবার ইংলণ্ড ঘুরে আসবে, এই রকম কথা আছে।

পাঁচমাস স্বামী বাইরে! আমি আগেই ধরেছিলাম, তার গর্ভাবস্থা মাস তিনেকের বেশি হইতেই পারে না।

এতক্ষণ আপনাকে সব পরিষ্কার করেই বলতে পেরেছি, কারণ এপর্যন্ত আমার উদ্দেশ্য আমার কাছে খোলামেলা ছিল। এরপর আমার অবস্থা দাঁড়াল বিকারগ্রস্ত রোগীর মত। ডাক্তার হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে আমিও তা বুঝতে পারলাম। নিজের ওপর আমার আর কোন হাত রইল না। চালচলন যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারলেও সামলাবার ক্ষমতা নেই আর।

'ভূতগ্রস্ত' কথাটা কি আপনি শুনেছেন? মালয়ীদের মধ্যে এ ধরনের পানোন্মত্ততা হর্দম দেখা যায়।

না, শুধু পানোন্মত্ততা নয়, তার চেয়েও এ ভয়ঙ্কর। এ অবস্থায়

মানুষ পাগলা কুকুরের চেয়েও মারাত্মক হয়ে ওঠে, নৃশংস নরহন্তায় পরিণত হয়। এ এক ভয়াবহ ধরনের মানসিক বিকৃতি। প্রাচ্যে থাকার সময় এরকম বহু ঘটনার সংস্পর্শে আমি এসেছি, ঘটনাগুলো ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি—কিন্তু এর প্রকৃত কারণটার কখনো হদিশ পাইনি।

স্থানীয় পরিবেশ এর জন্যে খানিকটা দায়ী ; এই জোলো নির্জন দমবন্ধকারী পরিবেশ স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর ভীষণ ভাবে চাপ দিতে থাকে, শেষ পর্যন্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে একেবারে বিকল করে দেয়। অবিশ্যি সাধারণত অসহ্য ঈর্ষার বিষে, জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে বা ওই ধরনের কোন কারণে মালয়ীরা ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ভূতগ্রস্ত লোকটি নিজের ঘরে এমন শান্তশিষ্টের মত বসে থাকে যেন কোথাও কোন গোলযোগ নেই—মেয়েটি আসার আগে নিজের ঘরে আমি যেরকম ছিলাম। তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়, নিজের ভোজালিটি হাতে নেয়, রাস্তায় নেমে আসে, এবং বরাবর সামনের দিকে ছুটতে থাকে - সে-পথ যেদিকেই যাক না কেন। যেতে যেতে সামনে যাকে পায় তারই ওপর ভোজালির কোপ বসায়। আর, এইভাবে যত রক্তপাত ঘটতে থাকে ততই সে হিংস্র হয়ে উঠে। মুখে চিৎকার, ঠোঁটের দুপাশে লালা, চোখে জল, হাতে রক্তাক্ত ভোজালি—অবিরাম ছুটে চলে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। সকলেই জানে মৃত্যু ছাড়া এই উন্মাদকে রোখার সাধ্য কারো

নেই। তাই তারা তখন চীৎকার করে করে অন্যদের সাবধান করে দেয়। আর ভূতগ্রস্ত লোকটা ছুটতে থাকে, হাতের কাছে যাদের পায় খুন করতে করতে সে শুধু ছুটেই চলে যে পর্যন্ত না পাগলা কুকুরের মত তাকে গুলি করে মারা হয়।

ভূতগ্রস্ত মালয়ীদের আমি দেখেছি, তাই নিজের অবস্থাটা সহজেই বুঝতে পারলাম। এই রকম একজন মালয়ীর মতই সেই ইংরেজ মেয়েটির পিছনে আমি উন্মাদের মত ছুটে চললাম, হিতাহিত জ্ঞান রইল না। মনে শুধু একটি কামনা— যে করেই হোক, যেমন করেই হোক, দেখা ওর আবার পেতেই হবে।

ওর নামধাম জানার মিনিট কয়েকের মধ্যে সেটেলমেণ্ট এলাকা থেকে আর একটি সাইকেল জোগাড় করে ঊর্ধশ্বাসে ফিরে এলাম নিজের বাসায়। দুইএকখানা পরিধেয় ও একতাড়া নোট ছাড়া কিছুই আর নিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলাম সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশনে।

আমার স্থানত্যাগের কথা জেলা আফিসারকেও জানান হল না। ঘরদোর যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল। চাকরবাকরেরা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল হুকুমের প্রত্যাশায়, তাদের দিকে ফিরেও তাকালাম না। মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অতীতের সাথে আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, ভূতগ্রস্তের মত আমি অনির্দেশের পথে পাড়ি দিলাম।

বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক থাকলে বুঝতে পারতাম, এত তাড়াহুড়ো করেও কোন ফল হবে না। কেননা যখন স্টেশনে পৌঁছলাম, সন্ধ্যে হয়-হয়। এসব এলাকায় দুর্ঘটনার ভয়ে অন্ধকারে ট্রেন চলাচল করে না। অতএব কাছের একটি ডাক-বাংলোয় অতন্দ্র রাত অতিবাহিত করে এবং পরের দিনটা ট্রেনে কাটিয়ে সন্ধ্যা ছটা নাগাদ শহরে এসে উঠলাম।

জানি, মোটরে ও আমার অনেক আগেই এসে পৌঁছেছে। মিনিট দশেকের মধ্যে ওর বাড়ির দরজায় হাজির হলাম।

আপনি হয়ত বলবেন, এর চেয়ে বোকামী আর কি আছে? জানি, আমিও তা বুঝি। কিন্তু ভূতগ্রস্তের কার্যকলাপ ভূতগ্রস্তের মতই হয়—সে নিজেও জানেনা তার শেষ কোথায়, পরিণাম কি!

কার্ড পাঠালাম। একটি চাকর বেরিয়ে এল। সেই চীনা ছেলেটা নয়, মনে হয়, সে তখনো ফিরে আসেনি। চাকরটা জানাল, গিন্নিমার শরীর ভালো নয়, কারো সাথে তিনি দেখা করতে পারবেন না।

রাস্তায় নেমে এলাম। ঘণ্টাখানেক বাড়িটার চারপাশে ঘুরঘুর করলাম। মনে তখনো ক্ষীণ আশা—হয়ত ও দয়া করবে, হয়ত আমায় ডেকে পাঠাবে!

অবশেষে কাছের এক হোটেলে গিয়ে উঠলাম। কয়েক বোতল হুইস্কি আর এক ডোজ কড়া ঘুমের ওষুধ—আমার চেতনা বিলুপ্ত হল।

জাহাজের ঘড়িতে আটটা বাজল। অর্থাৎ ভোর চারটে। ঘণ্টার শব্দে বক্তা চমকে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথাও বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে আবার তিনি শুরু করলেন।

এর পরের অবস্থাটা বলে বোঝান শক্ত। আমার উত্তেজনা তখন উন্মত্ততার সীমায় পেঁাছেছে। পুরোপুরি ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি শহরে পেঁাছাই, আর তার পরের দিন সকালেই জানতে পারি শনিবার ওর স্বামী ফিরছে। হাতে মাত্র তিনটি দিন। এর মধ্যেই ওকে উদ্ধার করতে হবে। একটি মুহূর্তও আর অপচয় করা চলবে না।

কিন্তু ও-ও যে আমার মুখ দর্শন করবে না!

একদিকে ওকে সাহায্য করবার প্রবল কামনা অন্যদিকে প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে আমার স্নায়ুমণ্ডলী আরও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, সরু একটি সূতোর ওপর ঝুলছে সব কিছু, কিন্তু ওর সাথে আমি এমনই জঘন্য ব্যবহার করেছি যে আমায় ও আর কাছেই ঘেঁষতে দেবে না।

মনে করুন, আপনি কাউকে আত্মহত্যার পথ থেকে সরে যাবার জন্যে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছেন আর সে কিনা আপনাকেই

হত্যাকারী মনে করে ক্রমেই আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সরাসরি আত্মহত্যার পথেই পা বাড়াচ্ছে। ও শুধু আমাকে নির্লজ্জ এক কামুক হিসেবেই দেখল—কুৎসিত প্রস্তাবে একবার ওকে অপমানিত করেছি, আবার যেন সেই প্রস্তাব নিয়েই এসেছি আমি।

সমস্ত ব্যাপারটাই এমন উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। আমি চাই ওকে সাহায্য করতে, ও চায় আমার থেকে দূরে দূরে থাকতে। ওর জন্যে যে-কোন অপরাধ করতে আমি কুণ্ঠিত নই, কিন্তু আমার কথায় ও কান দিলে তো!

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি, সেই চীনা ছেলেটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। বুঝলাম, আমি যে ট্রেনে এসেছি ও-ও ফিরেছে সেই ট্রেনেই। বোধ হয় ছেলেটা পাহারা দিচ্ছিল, কেননা আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে উধাও হল। সম্ভবত আমার উপস্থিতির খবরটা দেবার জন্যেই ভেতরে চলে গেল।

মনে একটু আশা জেগেছিল, হয়ত এতক্ষণে ও বুঝতে পেরেছে যে আমি সাহায্য করতেই এসেছি। এবং এবার ও-ও হয়ত আমার সাহায্য গ্রহণ করবে। কিন্তু ছেলেটাকে দেখার সাথে সাথে আমার মনের ধারা বদলে গেল, আত্মগ্লানি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—কিছু না জানিয়েই আমি দরজা থেকে ফিরলাম।

মনে অকথ্য জ্বালা নিয়ে ঘুরতে লাগলাম ইতস্তত। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম ভাইস-রেসিডেণ্টের বাড়ি। মোটর

দুর্ঘটনায় এই ভদ্রলোকেরই পা ভেঙেছিল, আমি সারিয়ে ছিলাম।

ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন, আমায় দেখে খুবই খুশি হলেন। হ্যাঁ, আপনাকে কি বলেছি, ওলন্দাজদের মত আমিও অনর্গল ওদের ভাষা বলতে পারি? হল্যাণ্ডের এক স্কুলে কয়েক বছর পড়েছিলাম কিনা।

তবু আমার আচারে-ব্যবহারে কথা-বার্তায় হয়ত অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছিল। কারণ সেই ভদ্রলোক ভদ্রতা বজায় রেখেও চোখে মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুললেন যেন তিনিও টের পেয়েছেন যে আমি ভূতগ্রস্ত। তাঁকে বললাম, বদলী হবার জন্যেই আমি চলে এসেছি, ওখানকার নির্জনতা আর আমার সইছে না—এই প্রাদেশিক রাজধানীতে অবিলম্বে আমাকে বদলী করা হোক।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বললেন, 'মন ভেঙে গেছে, না? হুঁ! বুঝি তো সব, কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে—এই ধরুন, তিন-চার হপ্তা, এর মধ্যেই আপনার জায়গায় আমরা অন্য লোক খুঁজে নেব।'

'তিন-চার হপ্তা!' আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম, 'একটি দিনও আমি আর ওখানে থাকতে পারব না।'

আবার তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। বললেন, 'কি করব বলুন, উপায় নেই! বদলী কাউকে না রেখে ও-জায়গা

আপনি ছাড়বেন না। যাক, আপনাকে কথা দিচ্ছি—আজকের মধ্যেই আমি এর একটা কিনারা করে ফেলব।'

ঠোঁট কামড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালাম। এই প্রথম বুঝতে পারলাম দাসত্বের কাছে কি ভাবে আত্মবিক্রয় করে বসে আছি।

ভদ্রলোক যথেষ্ট কূটবুদ্ধি। আমার মনের ভাব টের পেয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'ওখানে আপনি যেমন সাত্ত্বিক ভাবে দিন কাটাচ্ছেন মনের আর অপরাধ কি! আমরা তো একেক সময় অবাক হয়ে যাই—ছুটিছাটাও চান না, আমাদের এখানেও আসেন না—কি ব্যাপার! মাঝে মাঝে একটু ফুর্তিটুর্তি করা দরকার, নইলে—হ্যাঁ ভালো কথা, গভর্ণমেণ্ট হাউসে আজ সন্ধ্যেয় এক আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনিও আসুন না? কলোনীর প্রায় সকলেই আসছেন। অনেকে প্রায়ই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন, আপনার সাথে আলাপ করতে চান—তাঁরাও আসবেন।'

এইখানে তিনি একটি মোক্ষম চাল চাললেন। সকলেই আমার কথা জিজ্ঞেস করে? আমার সাথে আলাপ করতে চায়? এদের মধ্যে ও-ও কি আছে? মদের মত এই চিন্তা আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলল।

হঠাৎ কেতাদুরস্ত হয়ে উঠলাম। আমন্ত্রণের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম ঠিক সময়েই আমি যাব।

কিন্তু ঠিক সময়ে নয়, বড় বেশি আগেই গিয়ে হাজির হলাম।

গিয়ে দেখি, কেউই তখনো আসেননি। প্রায় মিনিট পনেরো চুপচাপ একাই বসে রইলাম।

অতঃপর অতিথিরা একে একে আসতে লাগলেন। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এলেন সস্ত্রীক। তারপর দেখা গেল ভাইস-রেসিডেণ্টকে। তিনি ঢুকেই আমায় সাদর সম্বর্ধনা জানালেন, বাক্যালাপ শুরু করে দিলেন। আমিও তাল দিয়ে যেতে লাগলাম। কাটল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে উঠল, কোনমতে টাল সামলে নিলাম—

'ও ঘরে ঢুকছে!

ভাগ্যগুণে, ঠিক এই সময়েই ভাইস-রেসিডেণ্ট আমাকে ছেড়ে আরেকজনের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। নইলে হয়ত আমি আর ভদ্রতা বজায় রাখতে পারতাম না, কথার মাঝখানেই তাঁর কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতাম।

হলুদাভ সিল্কের পোশাক ওর পরনে, গজদন্তের মত শুভ্র গ্রীবাটির সঙ্গে আশ্চর্য সুন্দরভাবে তা মানিয়ে গেছে। চোখেমুখে খুশির রোশনাই জ্বেলে কথা কইছে কয়েকজনের সঙ্গে। কিন্তু, আমি তো জানি, ওর গোপন ব্যথার কথা। আমি তো দেখছি [এ দেখা হয়ত নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত] এই খুশির আড়ালে চলেছে কী গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত!

এগিয়ে গেলাম, কিন্তু ও আমায় দেখতে পেল না, হয়ত ইচ্ছে করেই দেখল না। হাসছে তো হাসছেই।

ওর এই হাসি আমায় আবার উত্তেজিত করে তুলল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কত কৃত্রিম এ হাসি। আজ বুধবার, শনিবার স্বামী ফিরছে। তবু এমন প্রাণ-খোলা হাসি ও হাসে কি করে? আমি বাইরের লোক, ওর ভবিষ্যৎ ভেবে আমারই কাঁপুনি ধরে গেছে। বাইরের লোক হয়েও আজ দুদিন ধরে ওরই দুর্ভাগ্যের বোঝা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। আর ও কিনা দিব্যি হেসে খেলে চলেছে? ভেতরে যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে এই হাসি সেটা গোপন করবার এক মুখোস ছাড়া আর কী?

পাশের ঘর থেকে সঙ্গীতের সুর শোনা গেল। এবার নাচ শুরু হবে। মধ্যবয়সী এক অফিসার ওকে নাচের সঙ্গিনীর হিসেবে প্রার্থনা করলেন। আশেপাশের লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আফিসারটির বাহুবন্ধ হয়ে ও চলে গেল নাচঘরে। যাবার সময় একবার আমার কাছাকছি এসে পড়ল, দেখল, মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠল।

তারপর ওকে আমি চিনব-কি-চিনব-না ভেবে ঠিক করবার আগেই অতি পরিচিতের মত মাথা হেলিয়ে বলল, 'গুড-ইভনিং, ডাক্তার!' বলেই চলে গেল।

বিভ্রান্ত আমি। আমরা যে পরস্পরের পরিচিত—প্রকাশ্য-ভাবে কেন ও তা স্বীকার করে নিল?

তবে কি ও আপোষ করতে চায়—এটা তারই ভূমিকা?

নাকি, আমায় দেখে শুধু খানিকটা অবাক হয়েছে মাত্র, তার

বেশি কিছু নয়—নিজের জেদ ও ছাড়বে না কিছুতেই ? ভাবতে ভাবতে মাথায় মধ্যে চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যায়।

নাচের সময় ওকে লক্ষ্য করলাম—ঠোঁটের কোণে পরম পরিতৃপ্তির হাসি। হায়রে! আমি তো জানি, এখন নাচের কথা ও মোটেই ভাবছে না।

আমি যা ভাবছি, ও-ও ভাবছে তা-ই—ভাবছে সেই পরম-গোপন কথা যা কেবল জানি আমরা দুজনেই।

বারবার ঘুরে-ফিরে চোখ শুধু ওর ওপর গিয়ে পড়তে লাগল, শেষ পর্যন্ত একদৃষ্টে ওরই দিকে তাকিয়ে রইলাম—বারেকের জন্যে যদি ওর এই খুশির মুখোস খসে পড়ে !

আমার এই বেহায়াপনায় নিশ্চয় ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কেননা একবার চোখাচোখি হতেই দেখলাম, ওর চোখে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। আমাকে আরও সংযত আরও ভদ্র হবার জন্যে যেন শাসানি দিচ্ছে দুই চোখ।

কিন্তু, আপনাকে আগেই বলেছি, আমি তখন ভূতগ্রস্ত। ও কি বলতে চায় চোখ দেখেই তা বুঝেছিলাম। এত লোকজনের মধ্যে ও আমার কাছ থেকে আরও খানিকটা নিস্পৃহতা আশা করছিল। ওর ভয় পাছে আমি কোন কেলেঙ্কারী করে বসি।

হ্যাঁ, ও কি চায়, তা আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু, আমি তখন ভূতগ্রস্ত। এইখানে, এই মুহূর্তে, ওর সাথে কথা আমার না বললেই যেন নয়।

ঘরের একপাশে কয়েকজনের সাথে গল্পগুজব করছে। আমি সেদিকে এগোলাম। সবাই আমার অপরিচিত। তবু নিতান্ত অভদ্রের মত পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে চুপচাপ তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, সারা শরীর তখন আমার থরথর করে কাঁপছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এখানে আমি অবাঞ্ছিত। তবু নড়তে পারিনে। কেউ আমার সাথে একটি কথাও বলল না। এবং ও-ও যে আমার উপস্থিতিতে রীতিমত বিরক্ত তাও চাপা রইল না।

এইভাবে কতক্ষণ যে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম, বলা শক্ত। হয়ত চিরকাল। আমি যে তখন মন্ত্রমুগ্ধ!

কিন্তু ওর পক্ষে এটা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। হঠাৎ আলাপ-আলোচনায় ইতি টেনে মিষ্টি স্বরে বলল, 'আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। আপনাদের সকলের কাছে মাপ চেয়ে বিদায় নিচ্ছি। গুডনাইট!'

বন্ধুর মত সকলের দিকে একবার তাকিয়ে ও পিছন ফিরল।

এই সকলের মধ্যে অবিশ্যি আমিও একজন।

ওর চলমান তন্বী দেহটির দিকে আমি বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। একবারো মনে হল না, আজকের মত ওর সাথে এই আমার শেষ দেখা! একবারো মনে হল না, এত আশা করে এসেও কিছুই ওকে বলা হল না! অথচ, আজকের

এই সন্ধ্যার ওপর কী অপরিসীম প্রত্যাশাই না ছিল আমার! কিন্তু, কিন্তু—

কিন্তু তার আগে গোটা ছবিটা আপনার সামনে তুলে ধরা দরকার—তবেই আপনি বুঝতে পারবেন কী বেকুবিই না সেদিন আমি করেছিলাম।

হলঘরটি তখন প্রায় খালি। বেশির ভাগ লোকই নাচঘরে, কেবল কয়েকজন বুড়ো এখানে-ওখানে তাস পেতে বসেছে। ইতস্তত ছোটখাট আড্ডা জমেছে। বিরাট হলঘরটির মাঝখান দিয়ে ও ধীরপায়ে এগিয়ে চলেছে, চলার ভঙ্গিতে মর্যাদা আর মাধুর্যের মনোরম অভিব্যক্তি। যেতে যেতে মাথা নেড়ে নেড়ে দুপাশের লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি পাথরের মূর্তির মত। ঘরের শেষ সীমায় ও যখন উপনীত, হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম। আবার ও নাগালের বাইরে চলে যাবে? আমি ছুটতে লাগলাম।

হ্যাঁ, সেই বিরাট হলঘরের মসৃন মেঝের ওপর দিয়ে আমি সশব্দে ছুটতে লাগলাম। প্রত্যেকে আমার দিকে চেয়ে রইল অবাক চোখে, নিজেও আমি যে লজ্জা না পেলাম তা নয়—কিন্তু আমার তখন থামবার শক্তি নেই! দরজার কাছাকাছি গিয়ে ওকে ধরে ফেললাম।

আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল—দুই চোখ জ্বলছে, উত্তেজনায় থরথর করছে নাকের বাঁশি।

তবু অদ্ভুত আত্মসংযম। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে অজস্র হাসিতে ফেটে পড়ল।

সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'ও ডাক্তার! আশ্চর্য লোক আপনি! যাক, আমার ছেলের প্রেসক্রিপসনটার কথা এতক্ষণে তাহলে মনে পড়েছে? বিজ্ঞানের চর্চা করেন বলে আপনাদের মনটা বড্ড বেশি ভুলো হয়ে যায়—না?'

পাশে দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা এই রসিকতা উপভোগ করলেন। উপভোগ করলাম আমিও। যে আশ্চর্য কৌশলে ও আমার বোকামিকে চাপা দিল তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করলাম—মনে মনে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে পকেট-বুক বের করলাম, তার মধ্যে কয়েকটি পাতা খালি ছিল। তারই একটি ছিঁড়ে ওর হাতে দিয়ে বিড়বিড় করে ক্ষমা চাইলাম।

কাগজের টুকরোটি আমার কাছ থেকে নিয়ে মৃদু হেসে শুভরাত্রি জানিয়ে ও চলে গেল।

কেলেঙ্কারীটা ও-ই শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু বুঝলাম, এরপর আশা করবার কিছুই আর আমার রইল না। আমার মাত্রাছাড়ান ব্যবহারে আমার প্রতি ওর বিদ্বেষ আরও বেড়েই গেল। আগের চেয়েও এখন থেকে ও আমায় বেশি করে ঘৃণা করতে শুরু করবে। যতবার আমি

ওর কাছে যাব, বারবার এমনি দুরদুর করে কুকুরের মত দরজা থেকে তাড়িয়ে দেবে আমায়।

ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলাম। চারপাশ থেকে সবাই আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। হয়ত আমার চোখেমুখে অস্বাভাবিক কিছু ফুটে উঠেছে।

'বুফে'তে গিয়ে পরপর চার গ্লাস নির্জলা ব্রাণ্ডি শেষ করলাম। সমস্ত স্নায়ু-শিরা যেন ফেটে পড়তে চাইছে, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ছাড়া তাকে সংযত করার কোন উপায় নেই। তারপর একসময় চোরের মত পাশের এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। আস্ত একটা সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আবার ওই হলে পদার্পণ করতে, ওখানকার জোড়া জোড়া চোখের কৌতূহল আর কৌতুকের শিকার হতে আমি রাজি নই!

কিন্তু তারপর?

তারপর আমি কি করেছিলাম?

কিছুই আজ মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, এক দোকান থেকে অন্য দোকানে গিয়ে বেপরোয়া মদ গিলেছি।

আকণ্ঠ পান করেছি, তবু শান্তি পাইনি, স্বস্তি পাইনি, সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়নি।

প্রতিমুহূর্তে যেন ওর সেই হাসি আমার কানে বাজছে—যে-হাসি প্রথম আমাকে উন্মত্ত করে তোলে, আজ সন্ধ্যায় আমার বোকামিকে ঢাকবার জন্যে যে-হাসি ও হেসেছিল।

সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বারবার শুধু আফসোস হয়, কেন আমি আমার পিস্তলটা সঙ্গে করে আনিনি? তাহলে তো অনায়াসে এখন ঝিঁঝিঁ-ধরা এই মাথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে ওই ঠাণ্ডা নিস্তরঙ্গ জলে শরীর জুড়োতে পারতাম!

শান্তি পেতাম, চিরশান্তি!

পিস্তলের কথাটাই একান্তভাবে পেয়ে বসল। ঠিক করে ফেললাম, এই দুর্বহ জীবনের অবসান ঘটাতেই হবে। এছাড়া কোন পথ নেই আমার।

দ্রুত হোটেলের দিকে অগ্রসর হলাম।

তখন যে আমি নিজেকে গুলি করিনি, বিশ্বাস করুন, তার কারণ ভীরুতা নয়। জানি সেই অসহ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আত্মহত্যা ছাড়া গতি আমার ছিল না। তবু আমি আত্মহত্যা করলাম না, কেননা আমার মধ্যে তখন কর্তব্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, কর্তব্যবোধ! হয়ত এখনো ওর আমাকে প্রয়োজন থাকতে পারে—এই কথাটা মনে হওয়ার সাথে সাথে আমার মধ্যে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। আজ বৃহস্পতিবার সকাল, আর দুদিনের মধ্যেই স্বামী এসে পড়বে। আমি স্থির জানি, যেরকম গরবিনী মেয়ে ও

তাতে করে কিছুতেই এই কালামুখ নিয়ে স্বামীর সামনে দাঁড়াবে না। দাঁড়াতে পারবে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকি। কত বড় কর্তব্য আমার সামনে, তবু আমি কিছুই করতে পারছি নে—নিজের এই অক্ষমতায় শরীর-মনে জ্বালা ধরে গেল। কি বলে এখন ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াই? কি করে বোঝাই, যে ওকে সাহায্য করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই নেই আমার? আমার সাথে ও দেখা করলে তো! আমার মুখই আর দেখবে না! ওর সেই অট্টহাসির শব্দ এখনো আমার কানে বাজছে, চোখের সামনে এখনো যেন দেখছি অবরুদ্ধ ক্রোধে স্ফীত দুই নাসারন্ধ্র।

অস্থিরভাবে আমি পায়চারি করতে লাগলাম ছোট্ট ঘরটির মধ্যে। সারাটা রাত কাটল এমনি ছটফট করে।

তারপর একসময় রাত শেষ হল, সূর্যের আভা ফুটল।

বসলাম। চিঠির প্যাডটা টেনে নিয়ে ওর উদ্দেশে এক চিঠি লিখতে শুরু করলাম।

সব খুলে লিখলাম। স্বীকার করলাম আমি উন্মাদ, আমি পাষণ্ড। তবু এবারের মত ও আমায় ক্ষমা করুক, দয়া করে একবার শুধু আমায় বিশ্বাস করুক, ওর সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিক। প্রতিজ্ঞা করলাম, কাজ শেষ হওয়ায় সাথে

সাথে আমি চলে যাব—এই শহর ছেড়ে কলোনী ছেড়ে, এমন কি, ও যদি চায়, এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেও আমি প্রস্তুত। ও শুধু আমার সব অপরাধ মার্জনা করুক, আমায় বিশ্বাস করুক, এই চরম মুহূর্তে ওকে সাহায্য করবার সুযোগটুকু দিক আমাকে।

প্রায় কুড়ি পৃষ্ঠা ভরে লিখলাম চিঠি। হয়ত সে-সবই আবোল-তাবোল অর্থহীন। বিকারের ঘোরে কিম্বা পাগলা গারদে বসে কেউ চিঠি লিখলে এই রকম চিঠিই হয়ত লিখত।

লেখা যখন শেষ হল, সারা শরীর আমার ঘেমে গেছে।

উঠে দাঁড়ালাম, মাথা ঘুরছে। ঢকঢক করে এক গ্লাস জল নিঃশেষ করে চিঠি পড়তে লাগলাম। কিন্তু অক্ষরগুলো যে চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে!

চিঠিটা খামে পুরতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল আরও কিছু লেখা দরকার। পেনটা তুলে নিয়ে শেষ পৃষ্ঠায় আড়াআড়িভাবে লিখলাম—

> 'আমায় ক্ষমা করেছেন—শুধু এই কটি কথার প্রত্যাশায় হোটেলে প্রতীক্ষা করে আছি। আজ সন্ধ্যেব মধ্যে আপনার জবাব না পেলে আমি আত্মহত্যা করব।'

খাম বন্ধ করে হোটেলের একটা বয়কে ডাকলাম। চিঠিটা তার হাতে দিয়ে অবিলম্বে সেটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলাম।

তারপর জবাবের প্রত্যাশায় মুহূর্ত গোণা ছাড়া আমার করণীয় আর কিছুই রইল না।

বোধ হয় এই বিরতিটাকে বোঝাবার জন্যেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর আবার শুরু করলেন—

খৃষ্টধর্মের কোন মূল্যই আমার কাছে নেই। এর স্বর্গ-নরকের রূপক কাহিনী আমার মনে কোন রেখাপাতই করে না। কিন্তু নরক বলে যদি কিছু থেকেও থাকে, তাকে আমি ভয় পাই নে। কারণ হোটেলে প্রতীক্ষার সেই সময়টুকু যেভাবে আমার কেটেছিল, নরকের আবহাওয়া নিশ্চয় তার চেয়ে ভয়াবহ মারাত্মক কিছু নয়।

টেবিলের ওপর হাতঘড়ি আর পিস্তল, সামনের চেয়ারে একজন বসে আছে—ঘড়ি আর পিস্তলটার ওপর দৃষ্টি তার স্থির। সারাদিন একবারে অভুক্ত, পানপাত্রে একবারো চুমুক দেয়নি, এমন কি, ধূমপান পর্যন্ত করেনি —ঘড়ির ডায়ালের দিকে সে অপলক চেয়ে আছে, দেখছে কিভাবে অবিরাম ঘুরে চলেছে সেকেণ্ডের কাঁটা।

সারাটা দিন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিলাম। নিছক প্রতীক্ষায়। শুধুই প্রতীক্ষায়! শরীর প্রস্তরীভূত, তবু আমার অবস্থা এক ভূতগ্রস্ত মালয়ী বা পাগলা কুকুরের মত—ধ্বংসের পথে যে উর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে।

তিনটে বেজে কুড়ি মিনিটের সময় [আমার চোখ তখনো ঘড়ির কাঁটায়] দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। তারপর একটা ছেলে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ হাতে ঘরে ঢুকল। কাগজের টুকরোটা তার হাত থেকে আমি প্রায় ছিনিয়ে নিলাম। ছেলেটাও চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ছোট্ট চিঠি! যাক, তবু জবাব তো দিয়েছে!

চিঠিটা প্রথম ধাক্কায় পড়তেই পারলাম না, অক্ষরগুলো সব যেন চোখের সামনে থেকে উবে উবে যাচ্ছে। চিঠির কোন অর্থই প্রথমবারে বোধগম্য হল না। উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে মাথাটা বেশ করে ধুয়ে চোখেমুখে ভাল করে জলের ছিটে দিয়ে এলাম। তারপর খানিকটা আত্মস্থ হয়ে ফের খুললাম চিঠি। পেন্সিলে লেখা ইংরেজীতে মাত্র তিনটি লাইন—

> 'বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে। তবু আপনি হোটেলেই অপেক্ষা করুন। শেষ সময়ে আপনাকে প্রয়োজন হতে পারে।'

তলায় কোন স্বাক্ষর নেই। খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে যেন লেখা হয়েছে চিঠিটা। অক্ষরগুলো এবড়ো-থেবড়ো। বোধ হয়, খুব উত্তেজনার মুহূর্তে কিম্বা চলন্ত গাড়িতে বসে লেখা। ঠিক জানি না। কি করেই বা আমি জানব? তবু খুশি হলাম।

ও অন্তত আমায় চিঠি লিখেছে!

এখন আমাকে বাঁচতেই হবে। হয়ত আমায় ওর প্রয়োজন হতে পারে, হয়ত শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য ও চাইতে পারে।

সারা বুক আমার আশায় উদ্বেল হয়ে উঠল। বারবার চিঠিটা পড়লাম। বারবার চিঠিটাকে চুমু খেলাম। ধীরে ধীরে স্নায়ুমণ্ডলী ঝিমিয়ে এল, আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে দিয়ে সময় কাটতে লাগল।

কেটে গেল ঘণ্টাকয়েক। যখন চেতনা ফিরে এল, সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে। ছটা বাজে নিশ্চয়। দরজায় কি আবার কেউ ধাক্কা দিচ্ছে? কান খাড়া রইলাম।

না, ভুল না, সত্যি কে যেন ধীরে ধীরে দরজায় করাঘাত করছে।

স্খলিত পদে তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। খুললাম দরজা, দেখি সেই চীনা ছেলেটি দাঁড়িয়ে। আবছা আলোতেও তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমারি দুর্ব্যবহারের চিহ্ন তার চোখেমুখে। কিন্তু এমনিতেও মুখখানি কেমন যেন ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেছে। ও শুধু বলল, 'শিগ্‌গীর চলুন সাব!'

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে আমি তরতর করে নামতে লাগলাম, ছেলেটা আমার পিছনে পিছনে।

বাইরেই একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, লাফিয়ে গিয়ে উঠলাম। কিছু বলার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

এতক্ষণে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছেরে?'

ছেলেটা আমার দিকে তাকাল। ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

একই প্রশ্ন আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এবারো সে জবাব দিল না। মাথা গরম হয়ে গেল, ইচ্ছে হল, ফের এক ঘা বসিয়ে দি ওর চোয়ালে। কিন্তু ছেলেটার আশ্চর্য প্রভুভক্তি আমায় মুগ্ধ করেছে। নিজেকে সংযত করলাম। ও যদি কথা না বলতে চায়, কারো সাধ্যি নেই ওকে দিয়ে কথা বলায়। এতো আমি জানিই।

গাড়োয়ান খচ্চর দুটোর পিঠে হর্দম লাগাম কষাচ্ছে, বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। চাপা পড়ার ভয়ে রাস্তার লোকজন ছুটোছুটি করে এপাশ ওপাশ সরে যাচ্ছে। রাস্তায় বেশ ভীড়। কেননা এটা ইয়োরোপীয় এলাকা নয়, নেটিভদের আস্তানা। আমাদের গাড়ি চলেছে চীনা বস্তির দিকে।

সংকীর্ণ এক গলির মুখে এসে গাড়ি থামল। সামনেই জরাজীর্ণ একটা বাড়ি। একপাশে ছোট একটি দোকান, মোমবাতির মিটমিটে আলো জ্বলছে দোকানে। সমস্ত জায়গাটা জঘন্য নোংরা। আর অন্ধকার। দোকানেরই লাগোয়া তৃতীয় শ্রেণীর একটা হোটেল। প্রাচ্যের চীনা শহরগুলির এই সব অঞ্চলেই চণ্ডুখোর, বেশ্যা, চোরছ্যাঁচররা এসে ভীড় জমায়, চোরাকারবারের অবাধ লেনদেন চলে।

ছেলেটা নেমে গিয়ে দরজায় ঘা দিল। দরজার পাল্লা সামান্য খুলল, ফিসফাস কী সব কথাবার্তা চলতে লাগল।

এদিকে আমি অধৈর্য হয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম, দরজার কাছে দাঁড়ানো একটা চীনা বুড়িকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। ভয় পেয়ে বুড়িটা আমার সামনে থেকে চম্পট দিল।

সরু বারান্দাটা পার হয়ে আরেকটা দরজার সামনে গিয়ে পৌঁছলাম, চীনা ছেলেটা ঠিক আমার পেছন পেছন আসছে।

কিন্তু সেই দরজাটা খোলার সাথে সাথে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে এল—ব্রাণ্ডি আর রক্তের গন্ধে ভারী বাতাস! আর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার!

আর অন্ধকারের মধ্যে কে যেন গোঙাচ্ছে।

গোঙানির শব্দ লক্ষ্য করে আমি এগোলাম।

আবার কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।

ফের যখন তিনি শুরু করলেন, গলার স্বর তাঁর বদলে গেছে। কাহিনীর মর্মান্তিকতার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরও হয়ে উঠেছে অশ্রুসজল।

গোঙানির শব্দ লক্ষ্য করে আমি এগোলাম। দেখলাম ওকে।

দেখলাম ও পড়ে আছে ময়লা একটা মাতুরের ওপর, যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে। আর অবিরাম গোঙানি— মাঝে মাঝে হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

মুখ দেখতে পাচ্ছি নে, এ-ত অন্ধকার! অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওর শরীর স্পর্শ করি। করেই চমকে উঠলাম। ইশ্, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে! তারপর—।

ব্যাপারটা বুঝতে পারার সাথে সাথে আমার সর্বশরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল।

আমি যা করতে অস্বীকার করেছিলাম তারই জন্যে শেষ পর্যন্ত ও এসে এই চীনা ধাইয়ের শরণ নিয়েছে, নেমে এসেছে এই নরকে!

আমাকে ও বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু এদের বিশ্বাস করেছে! আমার থেকে এই বুড়ি ডাইনীটাকেই বেশি আপনার ভেবেছে!

এমন পাষণ্ডের মত ব্যবহারই ওর সাথে আমি করেছিলাম, এমন আঘাতই ওকে দিয়েছিলাম যে ও স্থির করেছিল, আমার কুৎসিত প্রস্তাবে রাজি হওয়ার চেয়ে এভাবে জীবন বিপন্ন করাও অনেক ভালো।

আলো! আলো! আলোর জন্যে চিৎকার করে উঠলাম। সেই বুড়িটা একটা কেরসিনের কুপি নিয়ে এল। ইচ্ছে হল, হারামজাদীর গলা টিপে ধরি—কিন্তু, কী লাভ! টেবলের ওপর সে কুপিটা নামিয়ে রাখল। কুপির ম্লান আলোয় আমি এবার ওর মুখখানি দেখলাম, দেখলাম ক্ষতবিক্ষত দেহটিকে।

হঠাৎ যেন আমার মাথাটা সাফসুফ হয়ে গেল। একটু আগেও যে আমার মধ্যে অসৎ চিন্তা উঁকি দিয়েছিল তা স্রেফ ভুলে গেলাম, মন থেকে মুহূর্তে সমস্ত ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ মুছে গেল। এখন আমি ডাক্তার, অভিজ্ঞ এক চিকিৎসাবিদ—আমার সামনে মরণাপন্ন এক মানুষ। আমার সমস্ত শক্তি আর সাধ্য দিয়ে একে আমায় বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

ভুলে গেলাম নিজের দুর্ভাগ্যের কথা! আশ্চর্য এক আত্ম-বিশ্বাসের আলো জ্বলে উঠল মনের মধ্যে।

মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে, মৃত্যুকে পরাস্ত করতে হবে সম্মুখ-সমরে।

তার নিরাবরণ শরীরে হাত দিয়ে দিয়ে দেখি। দুদিন আগেও যা ছিল আমার পরম কামনার ধন, আজ তা আমার রোগীর

দেহ মাত্র। প্রাণটা এখনো কোনমতে ধুঁকছে, যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু ঘটতে পারে।
ওর রক্তে আমার হাত মাখামাখি হয়ে গেল, মনে তবু কোন বিকার জাগল না।
এখন আমি স্থিতধী বিশেষজ্ঞ এক চিকিৎসক। চিকিৎসক হিসেবেই বুঝতে পারলাম কত মারাত্মক ওর অবস্থা!

কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে, আর উপায় নেই! দেহটাকে এমনভাবে কাটাছেঁড়া করা হয়েছে যে রক্তস্রাব বন্ধ করা অসম্ভব। চোখের সামনে অবিরল ধারে জীবনী-শক্তি মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে!
কিন্তু এখানে, এই নরকে, স্রাববন্ধের জন্যে কোন্ যন্ত্রপাতির সাহায্য আমি পাব? যা দেখি, যাতে হাত দি, সবই নোংরা, অব্যবহার্য। এক টুকরো পরিষ্কার ন্যাকড়া, খানিকটা পরিষ্কার জল পাবারো এখানে উপায় নেই।
'আপনাকে এখুনি হাসপাতালে পাঠান দরকার।' আমি বললাম।
'না না না!' প্রতিবাদে ও কঁকিয়ে উঠল, গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'তার চেয়ে আমার মরণও ভালো। কেউ জানবে না, কেউ যেন না জানে একথা! আমায় বরং বাড়িতে নিয়ে চলুন, বাড়িতে নিয়ে চলুন আমায়!'

বুঝলাম মর্যাদা ওর জীবনের চেয়েও বড়।
হুকুম মেনে নিলাম।
ছেলেটা গিয়ে একটা গাড়ি ডেকে আনল। ধরাধরি করে আমরা ওকে গাড়িতে তুলে দিলাম। মুমূর্ষু অবস্থায় নিয়ে এলাম বাড়িতে। চাকরবাকরদের ভয়বিহ্বল দৃষ্টির সামনে দিয়ে নিজের ঘরে এনে ওকে শোয়ান হল।
তারপর শুরু হল সংগ্রাম। মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ভয়ঙ্কর এক সংগ্রাম।
আপনি আমার অপরিচিত, দিনের আলোয় আপনার মুখ আমি দেখিনি। আপনি হয়ত মজাসে তামাম দুনিয়া দাবড়ে বেড়াচ্ছেন—কিন্তু একবারো কি ভাবতে পারেন, বসে বসে চোখের সামনে একটি মানুষের মৃত্যু দেখা কি জিনিস? মুমূর্ষু কোন মানুষের পাশে শেষ সময় পর্যন্ত কখনো কি বসে থেকেছেন? দেখেছেন, কি ভাবে তার শরীর মৃত্যুর সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রাম করতে করতে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে, সমস্ত পেশী শিথিল হয়ে যায়? মৃত্যুপথযাত্রীর দুই চোখে যে অবর্ণনীয় আতঙ্কের ছায়া ফুটে ওঠে তা কি কখনো লক্ষ্য করেছেন? গলার ঘড়ঘড়ানির মধ্যে প্রাণের যে কাকুতি মাথা কুটে মরে একবারো শুনেছেন?
কাজকর্ম কিছু নেই, তাই আপনি এক ভূপর্যটক! মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনি লম্বা-চওড়া লেকচার দিয়ে থাকেন—

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সামান্যতম ভগ্নাংশও কি আছে আপনার ?

ডাক্তার হিসেবে এরকম ঘটনার সঙ্গে আমি পরিচিত। এক অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মৃত্যুকে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত আমি। কিন্তু সত্যিকারের মৃত্যু-দর্শন কাকে বলে জীবনে একবারই মাত্র তার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সেটা এই সেদিন, যখন সেই ভুতুড়ে রাত্রে তার পাশে বসে ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম—কি করে এই স্রাব বন্ধ করব, প্রবল জ্বরে আমার চোখের সামনেই ও শেষ হয়ে যাচ্ছে, কি করে আমি এই জর কমাব—কি করে রুখব আসন্ন মৃত্যুকে ?

একজন ডাক্তার, চিকিৎসা-শাস্ত্রে যে সুপণ্ডিত, চিকিৎসায় যে অভিজ্ঞ এবং আপনার মুনিজনোচিত মন্তব্য অনুযায়ী যার প্রধানতম কর্তব্য হল অপরকে সাহায্য করা—সেই ডাক্তার যখন কোন মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে অসহায় হয়ে বসে থাকে, তখন যে তার মনের অবস্থা কি হয় তা কি আপনি ভাবতে পারেন ?

নিজের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও, সব কিছু জানা সত্ত্বেও কিছুই সে করতে পারছে না। ওদিকে একটু একটু করে মুমূর্ষু নাড়ীর গতি ক্ষীণ হয়ে আসছে, এদিকে আমার হাত-পা বাঁধা। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারব না—সেখানে গেলে তবু

একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যেত। অন্য কোন ডাক্তারের সাহায্য নেয়াও চলবে না।

নিরুপায় বসে বসে মৃত্যু দেখা ছাড়া আমার আর করবার কিছু নেই। শুধু অকথ্য আত্মগ্লানিতে মরে যাওয়া বা অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে বৃথা আস্ফালন ছাড়া গত্যন্তর নেই আমার।

বুঝতে পারছেন? বলি, কথাটা আমার বুঝতে পারছেন মশায়? আমি ভেবেই পাই নে, কি ক'রে এই অবস্থায় লোকে বেঁচে থাকে? কেন সে নিজেও মুমূর্ষুর সহযাত্রী হয় না?

ওর বিছানার পাশে বসে আছি। যন্ত্রণার যাতে কিছুটা অন্তত লাঘব হয় সেজন্যে একটা মরফিয়া দিয়েছিলাম। এখন ও চুপচাপ শুয়ে আছে। দুই কপোল ছাইয়ের মত শাদা।

ওদিকে মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে চীনা ছেলেটা বসে। বিড় বিড় করে নিজের ভাষায় সে প্রার্থনা করছে তার ঈশ্বরের কাছে। একেকবার চোখাচোখি হয় আর অসীম প্রত্যাশায় চোখদুটি সে আমার দিকে তুলে ধরে—একটা বোবা জানোয়ারের কাকুতি তার চোখে।

কিন্তু, আমার অকর্মণ্যতা যে কতখানি তা শুধু জানি আমি। জানি, কিছুই আমি আর করতে পারব না, কিছুই করার সাধ্য নেই আমার।

এই চিন্তাই আমার যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে দিল। ব্যর্থ আক্রোশে একবার ইচ্ছে হল ওকেই কষে এক লাথি মারি,

লাথি মেরে ওর সব প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দি। কেন ও এখনো আমার দিকে অমন প্রত্যাশা-ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে? আমার ওপর এত নির্ভরতা ওর, অথচ কিছুই আমি করতে পারছি নে, পারব না—এ চিন্তাও যে অসহ্য!

কিন্তু—

কিন্তু আমরা দুজনে যে আবার একই গ্রন্থিতে বাঁধা। এই মুমূর্ষু নারীটিকে আমরা দুজনেই ভালোবাসি, এর পরম গোপন কথাটি শুধু আমরা দুজনে জানি!

ওৎ-পাতা জানোয়ারের মত ও আমার পিছনে বসে। আমি মুখ ফুটে কিছু বলার সাথে সাথে সচেতন হয়ে ওঠে, হুকুম তামিলের জন্যে ছুট করে উঠে দাঁড়ায়। হয়ত ভাবে, এমন কোন উপায় আমি বের করেছি যা দিয়ে এখনো শেষরক্ষা সম্ভব। মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যে নিজের রক্ত দিতেও ছেলেটা প্রস্তুত, আমি জানি। প্রস্তুত আমিই।

কিন্তু এখন রক্ত দিয়েই বা [যন্ত্রপাতি হাতের কাছে থাকলেও] কি লাভ, রক্তস্রাবই যখন বন্ধ করা যাচ্ছে না? এতে শুধু ওর কষ্টই বাড়বে।

ছেলেটা ওর জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। প্রস্তুত আমিও। এমনি ছিল ওর সম্মোহনী শক্তি।

আর আমার? এই স্রাব বন্ধ করে যে মৃত্যুর হাত থেকে ওকে বাঁচাব সে ক্ষমতাটুকুও নেই!

ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরে এল। গাঢ়-গভীর এক ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল, আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইল—এ চোখে আগেকার সেই অপরিসীম আত্মগর্বের লেশমাত্র নেই। জ্বরে ছলছল ম্লান দুই চোখ।

ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমায় দেখেই মুহূর্তের জন্যে একবার চমকে গেল—কে এই আগন্তুক? পরেই অবিশ্যি চিনতে পারল। আর সাথে সাথে চোখেমুখে ফুটে উঠল বিরূপতার ভাব, অবশ হাতদুটি শূন্যে বারেক আন্দোলিত হল।

ওর এই অস্বস্তি আমায় যেন চাবুক মেরে বুঝিয়ে দিল যে, সাধ্য থাকলে এক্ষুনি আমার কাছ থেকে ও ছুটে পালিয়ে যেত। যাক, তারপর হয়ত সব মনে পড়ল একে একে। শান্ত চোখে তখন তাকাল আমার দিকে।

নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তবু ও কথা বলতে চায়, উঠে বসতে যায়—কিন্তু বড় দুর্বল। পারল না।

ওকে স্থির থাকতে বলে আমিই একটু এগিয়ে গেলাম। যত আস্তেই কথা বলুক তবু যাতে শুনতে পাই, একেবারে ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়লাম।

হেলা ভরে তাকাল আমার দিকে, ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, তারপর ওর অনুচ্চ অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেলাম:

'কেউ জানবে না তো? ঠিক? কেউ না?'

'কেউ না।' প্রাণের ভেতর থেকে যেন আমার জবাব বেরিয়ে এল, 'কেউ—কোনদিন জানবে না।'

তবু ওর চোখের তারা ছটফট করে। অনেক কষ্টে আবার বলল ঃ

'প্রতিজ্ঞা করো, কেউ জানবে না। কথা দাও।'

আস্তে আস্তে ওর একটি হাত তুলে নিয়ে মন্ত্রের মত আবৃত্তি করলাম, 'আমি তোমায় কথা দিলাম।'

পরিপূর্ণ চোখে এবার তাকাল আমার দিকে। দুর্বলতার কালো ছায়া চোখেমুখে, তবু অপরিসীম কৃতজ্ঞতা আর আন্তরিকতার আলো যেন তাকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, যত ক্ষতিই ওর আমি করে থাকি না কেন, শেষ মুহূর্তে আমার প্রতি ও কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল, সস্মিত মুখে আমায় ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

একটু পরে আবার কথা বলবার চেষ্টা করল, শক্তিতে কুলোল না। পরম শান্তিতে এবার চোখ বুজল।

তারপর? সূর্য ওঠার আগেই শেষ হয়ে গেল সব।

সব শেষ!

দীর্ঘস্থায়ী নীরবতা।

ভয়ানক ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওঁকে। আলোর আভাষে আকাশের

নক্ষত্ররাজি ম্লান হয়ে আসছে। মৃত্নমন্দ হাওয়া বইছে। ভোর হয়ে এল। এসব দেশে রাত শেষ হয় বড় তাড়াতাড়ি।

একটু পরে ওঁর চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলেছেন, মুখখানি সুস্পষ্ট। গভীর দুর্ভাগ্যের ছাপ সে-মুখে।

চশমার ভেতর দিয়ে তির্যকভাবে আমার দিকে চাইলেন, যেন পরখ করে নিতে চান, যার কাছে এতক্ষণ ধরে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা উৎসারিত করে দিলেন সে মানুষটি কেমন?

তারপর আবার তিনি তাঁর কাহিনী শুরু করলেন—

ওর দিক থেকে সবই শেষ হয়ে গেল। আর আমি সেই অপরিচিত ঘরে ওর শব সামনে নিয়ে একা বসে রইলাম। এসব শহরে গুজব ছড়ায় দাবানলের মত। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোন কিছুই আমি প্রকাশ করব না। ভাবুন একবার আমার অবস্থাটা।

সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা ছিল এই নারী, সকলেই জানে স্বাস্থ্য তার চমৎকার। গত রাতেও ও গভর্ণমেণ্ট হাউসে নাচের আসরে যোগ দিয়েছে। আর এখন—মৃত।

এবং এই মৃত্যুর অদ্বিতীয় সাক্ষী যে ডাক্তার সে এই শহরে হঠাৎ-আগন্তুক মাত্র, এই নারীরই এক ভৃত্য তাকে ডেকে আনে। শেষ রাত্রির অন্ধকারে এই ডাক্তার আর সেই ভৃত্যই তাকে ছ্যাকরা গাড়িতে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। কাউকেই কাছে আসতে দেয়নি। সকালের আগে পর্যন্ত চাকরবাকরদের ডাকেনি, জানায়নি যে তাদের কর্ত্রী আর ইহজগতে নেই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তো এই খবর শহরময় ছড়িয়ে যাবে, বাইরের একজন ডাক্তার হয়ে তখন আমি কি

জবাবদিহি করব? মেয়েটিকে আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কি করেছি আর কি করতে পারিনি কি করে বলব সে কথা? কেন আমি অন্য কোন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাইনি আমার দায়িত্বের অংশ নেবার জন্যে? কেন? কেন? কেন?

জানি, আমার কপালে কি আছে। একমাত্র এই ছেলেটাই আমায় বাঁচাতে পারে। হাজার হলেও ও খুবই প্রভুভক্ত। ও জানে যে এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি, আরও অনেক হ্যাঙ্গাম পোয়ানো বাকি।

ওকে বললাম, 'সব বুঝতে পেরেছিস তো, না-কি? তোর মেমসাবের শেষ ইচ্ছে ছিল, এব্যাপারের কিছুই যেন কেউ না জানতে পারে।'

'জানি সাব।' সরল সুস্পষ্ট জবাব।

বুঝতে পারলাম, কথার তার নড়চড় হবে না।

মেঝে থেকে তাড়াতাড়ি ও রক্তের দাগ মুছে ফেলে জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখল। ওর এই তৎপরতা আমাকেও নাড়া দিয়ে গেল। নতুন উৎসাহে আমি সোজা হয়ে উঠলাম। সর্বস্ব হারাবার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে সেটুকু রক্ষার জন্যেই মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। আমি যে জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলাম সেটা ওর অন্তিম অনুরোধ—ওর গোপন কথা!

মৃত্যুর এক কল্পিত কাহিনী বানিয়ে ফেললাম, যে এল তাকেই সেই কাহিনী বলে গেলাম শান্ত চিত্তে গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

শত হলেও এসব দেশের লোকেরা আকস্মিক অসুস্থতাজনিত মৃত্যুর সাথে পরিচিত। সন্দেহ দেখা দিলেও সামনাসামনি কেউই ডাক্তারের কথা অবিশ্বাস করতে পারে না। সবাইকে বললাম, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভদ্রমহিলা এই চীনা ছেলেটিকে ডাক্তার ডাকতে পাঠান, ঘটনাচক্রে তার সাথে আমার পথে দেখা হয়ে যায়।

কিন্তু আর সকলকে এই বলে বোঝালেও একজনের জন্যে সত্যিই আমি চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। সিনিয়র সার্জেন। সমাধির আগে তিনিই দেহ পরীক্ষা করবেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল, শনিবার ওর স্বামী ফিরছে। মৃতদেহ দ্রুত সমাধিস্থ করা সব দেশেরই নিয়ম। এক্ষেত্রে তো করতেই হবে। কিন্তু এজন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আমার সই চলবে না, স্বাক্ষর চাই সিনিয়র সার্জেনের।

নটার সময় তিনি এলেন। আমিই অবিশ্যি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি আমার থেকে পদস্থ অফিসার, কিন্তু ভাইস-রেসিডেন্টের ভাঙা পা জোড়া দেওয়ার ঘটনাটার পর থেকেই তিনি আমার প্রতি বেশ খানিকটা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর এই বিরূপতা টের পেলাম। এতে বরং আমার মনের দৃঢ়তা বেড়েই গেল।

পাশের ঘরে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আমি ঢোকার সাথে সাথেই শুরু হল আক্রমণ।

'মাদাম ব্লাঙ্ক কখন মারা গেছেন?'

'সকাল ছটায়।'

'তোমাকে তিনি কখন ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'গতকাল সন্ধ্যায়।'

'তুমি জানতে আমিই তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক?'

'জানতাম।'

'তাহলে আমায় ডেকে পাঠালে না কেন?'

'সময় ছিল না। আর, তাছাড়া, মাদাম ব্লাঙ্ক তাঁর সব ভার আমাকেই দিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য কোন ডাক্তার ডাকতে তিনি বারণই করেছিলেন।'

কঠোরভাবে তিনি আমার দিকে তাকালেন। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

ক্রোধ দমন করে কৃত্রিম নিরাসক্ত স্বরে বললেন, 'বেশ, উত্তম কথা! উনি বেঁচে থাকতে আমাকে ছাড়াই তোমার চলেছে, এখন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তুমি সরকারী কর্তব্য পালন করেছ—ভালই করেছে। আমিও এবার আমার কর্তব্য করি, দেখি, মৃত্যুর কারণটা কি?'

জবাব দিলাম না। যে ঘরে মৃতদেহ ছিল সেখানে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

কিন্তু ঘরে পা দিয়েই, তিনি মৃতদেহ স্পর্শ করবার আগেই আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'মৃত্যুর কারণ পরীক্ষার প্রশ্নই উঠছে না, প্রশ্ন—কারণ আবিষ্কারের। মাদাম ব্লাঙ্ক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, যদি আমি তাঁকে বাঁচাতে পারি। কিন্তু নেহাৎ আনাড়ী এক চীনা ধাইয়ের সাহায্যে গর্ভপাতের চেষ্টার পরিণাম থেকে তাঁকে উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাঁর মানমর্যাদা রক্ষা করব। আমি চাই এ কাজে আপনি আমায় সাহায্য করুন।'

বিস্ময়ে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন।

'তুমি—তুমি আমাকে, মানে প্রদেশের সিনিয়র সার্জেনকে, চাও এই ধরনের এক অপরাধ চাপা দেয়ার কাজে সহায়ক হতে?'

'হ্যাঁ। আপনার কাছ থেকে এইটুকুই চাই আমি।'

'মানে', তিনি ভুরু কোঁচকালেন, 'তোমার অপরাধ গোপন রাখতে হবে আমাকে?'

'আমার যা বলবার বলেছি। মাদাম ব্লাঙ্কের কথা যদি বলেন, তবে বলব, তাঁর নিজের ভুল এবং অন্য কোন-একজনের অপরাধ—এই কথাটার ওপরই যখন আপনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন—থেকে তাঁকে রক্ষার জন্যে আমার যথাসাধ্য আমি

করেছি। নিজে আমি অপরাধী হলে, এখনো আপনি আমায় জীবিত দেখতেন না। সেকথা যাক, মাদাম ব্লাঙ্ক নিজেই তাঁর ভুলের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন, এবং এই গর্ভপাতের জন্যে যে দায়ী ,তাকে টানাটানি করেও লাভ নেই। কেননা, এঁর মর্যাদা' বিপন্ন না করে তো আপনি তাকে সাজা দিতে পারছেন না ? আর, আর আমিও তা হতে দেব না।'

'তুমি তা হতে দেবে না ? বটে ! এমনভাবে কথা বলছ যেন তুমিই আমার অফিসার। আশ্চর্য স্পর্ধা যা হোক ! আমাকে কিনা তুমি হুকুম করছ ! হুঁঃ, হঠাৎ যখন নিজের এলাকা ছেড়ে এলে তখনই আমি সন্দেহ করেছিলাম—নির্ঘাৎ ভেতরে কোন গোলমাল আছে। যাকগে—এখন নিজে পরীক্ষা করা ছাড়া আমার আর কিছু করণীয় নেই। আর, তোমাকেও বলে রাখি—যা দেখব অবিক-ল তাই আমি রিপোর্ট করব। জাল সার্টিফিকেটে নাম সই আমি কখনো করব না।'

আমার সহ্যের সীমা ছাড়াল।

'কিন্তু স্যর, এবারের মত যে আপনাকে করতেই হবে ! নইলে প্রাণ নিয়ে আপনি এ ঘর থেকে বেরোতে পারবেন না।' পকেটে আমি হাত দিলাম। পকেটে অবিশ্যি পিস্তল নেই, তবে ধাপ্পায় কাজ হল।

ভয়ে তিনি পিছু হটলেন, এক পা এগিয়ে গেলাম আমি।

দৃঢ় স্বরে বললাম, 'শুনুন, চরম কিছু করতে হলে সত্যি আমি

দুঃখিত হব। তবে এও মনে রাখবেন, আপনার বা আমার কারো জীবনের মূল্য আমার কাছে কানাকড়িও না। যে করেই হোক, এই মহিলার কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা বজায় আমি রাখবই। অবিশ্যি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনি যদি লিখে দেন যে আকস্মিক কোন রোগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইনি মারা গেছেন—তাহলে হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমি এই দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে চলে যাব। এমন কি, আপনি যদি চান, এর দেহ সমাধিস্থ হওয়ার পরমুহূর্তে নিজের কপালে গুলি করতেও আমি প্রস্তুত। এতে বোধ হয় আপনি রাজি হবেন, মানে—রাজি এতে আপনাকে হতেই হবে।'

আমার কণ্ঠস্বর ভাবভঙ্গি বোধ হয় রীতিমত আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছিল। কেননা, ভয়ে তিনি কুঁকড়ে গেলেন। আমি এক পা এগোই তো তিনি দু'পা পেছোন—যেমন করে ভয়বিহ্বল পথচারীরা রক্তাক্ত অস্ত্রধারী ভূতগ্রস্তের সামনে থেকে পিছু হটে। তাঁর মধ্যে সেই জাঁদরেল অফিসারী ভাবের আর চিহ্নমাত্র রইল না।

তবু শেষ প্রতিবাদের মত তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'জীবনে কোনদিন আমি জাল সার্টিফিকেটে সই করিনি। তোমার কথামত এতে সই করলে হয়ত কোন কথা উঠবে না। বুঝি তো সব! কিন্তু, এ ধরনের কিছু করা কি আমার পক্ষে উচিত?'

'প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী উচিত নয় ঠিক।' তাঁর মুখরক্ষার জন্যে আমি বললাম, 'তবে এটা একটা বিশেষ ক্ষেত্র। আপনিও যখন জানেন, সত্যি ঘটনা প্রকাশ পেলে একজন জীবিত মানুষ অবর্ণনীয় মনোকষ্ট পাবেন আর এক মৃত মহিলার সমস্ত মানমর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, তখনো কেন ইতস্তত করছেন?'

তিনি দোমনা ভাবে মাথা দোলাতে লাগলেন।

তারপর একটা টেবিলকে সামনে রেখে আমরা দুজনে এসে মুখোমুখি বসলাম। সব মিটমাট হয়ে গেল। যথারীতি সার্টিফিকেটও প্রস্তুত হল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'পরের জাহাজেই তাহলে তুমি ইয়োরোপ যাচ্ছ?'

'নিশ্চয়। আপনাকে তো কথাই দিয়েছি।'

আমার দিকে খানিকক্ষণ অপলক চেয়ে রইলেন। চোখে মুখে ব্যবসাদারীর ভাবভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন।

একটু পরে বললেন, 'ইওকোহামা থেকে ফিরেই ব্লাঙ্ক সস্ত্রীক দেশে যাবে ঠিক করেছিল। আমার মনে হয় বেচারা হয়ত স্ত্রীর মৃতদেহই দেশে নিয়ে যেতে চাইবে। জানো তো, তার টাকার অভাব নেই, তার মত লোকের পক্ষে এ ধরনের শখ দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। যাকগে, আমি এখনই মৃতদেহ কফিনস্থ করবার ব্যবস্থা করছি। ব্লাঙ্ক বুঝবে, এই গরম দেশে এ না করে তার প্রতীক্ষায় থাকার

উপায় ছিল না। তবু যদি তার মনে কোন সন্দেহ জাগে মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারবে না। হাজার হলেও সে ব্যবসায়ী, আমরা অফিসর! তাছাড়া, তাকে বৃথা মনোকষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই না আমরা একাজ করছি—কি বলো?'

কয়েক মিনিট আগেও যিনি ছিলেন আমার শত্রু এখন তিনি পরম মিত্র হয়ে দাঁড়ালেন। কেননা তিনি বুঝছেন, শিগগীরই আমার হাত থেকে চিরকালের মত রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু এরপরে তিনি যা করে বসলেন তা আমারও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। একান্ত আন্তরিকতার সাথে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি!

'আশা করি এবার তুমি মনে শান্তি পাবে।'

মানে—এর মানে কি? তবে কি আমি অসুস্থ? আমি কি তবে উন্মাদ?

ভদ্রতামাফিক ওঁর সাথে সাথে গিয়ে দরজার পাট খুলে দিলাম, বিদায় অভ্যর্থনা জানালাম।

আর, তারপরেই, আমার সমস্ত উৎসাহ উবে গেল। চোখের সামনে ঘরটা ঘুরতে লাগল, সব কিছু অন্ধকার হয়ে এল। ওর বিছানার পাশে আমি হতচেতন হয়ে পড়ে গেলাম।

ভূতগ্রস্ত মালয়ীকে শেষ পর্যন্ত যখন গুলি করে মারা হয়, হয়ত এমনি ভাবেই সে মাটি আশ্রয় করে।

জানিনা, মেঝের ওপর কতক্ষণ আমি এভাবে অচেতন হয়ে ছিলাম। হঠাৎ মৃদু পদশব্দে আমার চেতনা ফিরে এল। চোখ মেলে দেখি, সেই চীনা ছেলেটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—দুই চোখে কেমন অস্বাস্তর ভাব।

'এক সাব এসেছে। মেমসাবকে দেখতে চায়।'

'কাকেও এঘরে ঢুকতে দিবি নে।'

'কিন্তু, সাব—।'

ইতস্তত করল। ভয়ে ভয়ে তাকাল আমার দিকে, কি যেন বলবার বৃথা চেষ্টা করল একবার।

'কে সে ?'

মারের ভয়ে ভীত কুকুরের মত এবার ও থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুখে কারো নাম উচ্চারণ করল না।

শুধু বলল, 'সে—সেই—তিনি—।'

সে ! সে-ই !

এর চেয়ে বেশি বলার প্রয়োজনও ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কার কথা ও বলতে চাইছে।

আশ্চর্য, এতক্ষণ এর কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম !

এই অচেনা অথচ অতিচেনা লোকটিকে একবার দেখবার জন্যে আমার কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। চকিতে মনে পড়ে গেল, এই ঘটনার সাথে আরেকজন মানুষও তো জড়িত। যে মানুষটিকে মেয়েটি ভালোবাসত,

আমাকে ও যা দিতে অস্বীকার করেছিল তাকে তা দিয়েছিল স্বেচ্ছায়, সর্বপ্লাবী প্রেমের প্রতিদান হিসেবে। একদিন আগেও আমি এই লোকটাকে ঘৃণা করতাম, হাতে পেলে হয়ত টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। কিন্তু এখন—এখন তাকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আকুল হয়ে উঠল।

এখন যে তাকে আমি ভালোবাসি! হ্যাঁ, ভালোবাসি—ও যাকে ভালোবাসত আমিও তাকে ভালবাসি!

পাশের ঘরে এলাম। খুবই অল্পবয়েসী একটি আফিসার দাঁড়িয়ে আছে, আনত মুখে গভীর লজ্জার আর গ্লানির আর বেদনার ছাপ। পাতলা ছিমছাম চেহারা, সবে কৈশোরের সীমা পেরিয়েছে। নিজেকে বয়স্ক পুরুষ হিসেবে ঘোষণা করবার একটা সচেতন প্রয়াস সর্ব অবয়বে সুস্পষ্ট।

আমাকে নমস্কার করবার জন্যে হাত তুলল, হাত কাঁপছে।

ইচ্ছে হল, ওকে জড়িয়ে ধরি। হ্যাঁ, ওর প্রেমিক হিসেবে এই রকম একটি মানুষের কথাই আমি ভেবেছিলাম। পেশাদার প্রেমিক নয়, স্পর্শভীরু এক তরুণ যুবা। তাই না এর কাছে নিজেকে ও অমন করে বিলিয়ে দিতে পেরেছিল!

আমার সামনে অপ্রস্তুতভাবে ও দাঁড়িয়ে। আমার হঠাৎ-আবির্ভাব, আমার চোখের উদগ্র কৌতূহলী দৃষ্টি ওকে আরও অপ্রস্তুত করে ফেলেছে। ঠোঁট দুটি থরথর করছে, কোনমতে

যেন আত্মসম্বরণ করে আছে, এখুনি হয়ত দুচোখ বেয়ে অবাধ জলের ঝর্ণা নামবে।

ও-ই প্রথমে কথা বলল, 'ভেতরে যেতে আমি চাইনে। কিন্তু, মাদাম ব্লাঙ্ককে একবার—শুধু চোখে দেখব।'

কি-যে করছি খেয়াল নেই, ওর কাঁধে আমি হাত রাখলাম, ওকে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

বিস্ময়-বিহ্বল চোখে ও আমার দিকে তাকিয়ে, সে চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অসীম কৃতজ্ঞতা। মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আশ্চর্য এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। দুজনে তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালাম। শুয়ে আছে, মুখ ছাড়া সর্বশরীর শাদা সিল্কের আচ্ছাদনে আবৃত। আমার ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি ওর পক্ষে অস্বস্তিকর হতে পারে ভেবে আমি একটু দূরে সরে গেলাম।

হঠাৎ ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, নতজানু হয়ে তার বিছানার পাশে বসে পড়ল। বাইরে নিজের ভাবপ্রবণতার প্রকাশ সম্পর্কে কোন লজ্জাই যেন আর রইল না—ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল। অঝোরে কেঁদে চলল।

এক্ষেত্রে কী আমি বলতে পারি!

কিইবা করতে পারি!

খানিক পরে ওকে তুলে ধরে শোফায় এনে বসিয়ে দিলাম। নিজেও বসলাম পাশে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে ধীরে ধীরে ওর রেশমকোমল চুলে বিলি কাটতে লাগলাম।

চুরানব্বই

গভীর আবেগে আমার হাতখানি ও চেপে ধরল।

'ডাক্তার, সবকিছু আমায় খুলে বলুন। ও কি আত্মহত্যা করেছে? বলুন, ও কি—।'

'না।'

'তাহলে, তাহলে অন্য কেউ ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী? বলুন, বলুন?'

আমি আবার বললাম, 'না।' কিন্তু আমার ভেতর থেকে অন্য একটা জবাব ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে—'আমি আমি, আমি—আর তুমি। আমরা দুজনেই ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী। আমরা দুজন, আর ওর অলীক অহমিকা। কিন্তু এসব মনের কথা মনেই রইল।

মুখে বললাম, 'না, কেউ দায়ী নয়—এ সবই ওর ভাগ্য!'

'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে!' ও কঁকিয়ে উঠল, 'সব কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। পরশু রাতেও ওর সাথে নাচের আসরে দেখা হয়েছে, আমার দিকে তাকিয়ে ও হেসেছে—হঠাৎ একি হল! কেন ও এমন করে মরে গেল!'

মৃত্যুর একটা কল্পিত কাহিনী বললাম। কারো কাছেই—ওর প্রেমিকের কাছেও—যে সেই গোপন কথাটি প্রকাশ করা চলবে না।

সেদিন এবং তার পরের দুটি দিনও আমরা পরম বন্ধুর মত এক

সাথে কাটালাম। মুখে কিছু না বললেও দুজনেই বুঝতে পারছি—মৃত এক নারী আমাদের জীবনকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে গেছে।

ও কিন্তু জানতেও পারল না যে ওরই সন্তান ছিল তার গর্ভে। একদিন সে আমার কাছে এসেছিল ওর প্রেমের এই উপহারকে বিনষ্ট করবার জন্যে। কিন্তু আমি অস্বীকার করায় এমন পথ বেছে নেয় শেষ পর্যন্ত যা তার মৃত্যু ডেকে আনে।

এসব কথা ওকে না বললেও যে কদিন ওর বাসায় আমি লুকিয়ে ছিলাম, সব সময় শুধু তার কথা নিয়েই আমরা আলোচনা করতাম। সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রসঙ্গ আমাদের ছিল না।

হ্যাঁ, একটা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। আমার জন্যে তখন চারদিকে জোর তল্লাশি চলছিল।

কফিন বন্ধ করার পর তার স্বামী এসে পৌঁছয়। চারদিকে তার মৃত্যু নিয়ে তখন নানা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। স্বামীর মনেও সন্দেহ দেখা দিল—সে চাইল সরাসরি আমার মুখ থেকে আসল ব্যাপারটা জেনে নিতে। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্যের জন্যে যে লোকটা পরোক্ষভাবে দায়ী তার সাথে দেখা করার কথা ভাবাও আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল। তাই আমি আত্মগোপন করে ছিলাম।

আত্মগোপনের এই চারদিন আমি ঘরের বার হইনি। অবশেষে ওর প্রেমিকই একটি জাল পাশপোর্ট জোগাড়

করে দিল। তারপর একদিন গভীর রাতে আমি সিঙ্গাপুরগামী এক জাহাজে চেপে বসলাম। সর্বস্ব পড়ে রইল—আমার বাড়িঘর আসবাবপত্র, গত সাত বছর ধরে আমি যত কিছু গবেষণা করেছিলাম স—ব!

এ শহরে, এই দেশে বসবাস আমার পক্ষে অসম্ভব। ওখানে যেদিকে চাইব বারবার শুধু ওর কথাই আমার মনে পড়বে!

পারব না, আমি তা সইতে পারব না। ওকে ভোলবার জন্যে রাতের অন্ধকারে চোরের মত পালিয়ে এলাম।

তবু সব বৃথা হল। গভীর রাতে জাহাজে এসে উঠি, আমার বন্ধুও এসেছিল বিদায় জানাবার জন্যে। হঠাৎ দেখি কি, ধাতুর পাত দিয়ে মোড়া মস্ত বড় একটা বাক্স ক্রেনে করে জাহাজে তোলা হচ্ছে।

পলকেই চিনলাম, এ সেই কফিন! ওর কফিন! সেই জলাজঙ্গলের দেশ থেকে এই শহর পর্যন্ত আমি যেমন ওর অনুসরণ করে এসেছিলাম, ওর কফিনও আজ সেইভাবে আমাকে অনুসরণ করছে! কাছেই তার স্বামী দাঁড়িয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখতে লাগলাম। সে ইংলণ্ড যাচ্ছে। সম্ভবত ইংলণ্ডে পৌঁছে কফিন খুলে শব-ব্যবচ্ছেদ করানোর ইচ্ছে আছে। কৌতূহল জেগেছে, মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করবার।

সিঙ্গাপুরে আমি এই জাহাজে এসে উঠলাম, কফিনটাও

এতে তোলা হল। ওর স্বামীও এই জাহাজেই আছে। কিন্তু এখনো আমি ওকে পাহারা দিচ্ছি, শেষপর্যন্ত পাহারা দিয়ে যাব। ওর গোপন কথা ওই লোকটাকে কিছুতেই আমি জানতে দেব না। যার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ও মৃত্যুবরণ করল, তার হাত থেকে ওকে আমি বাঁচাবো। হ্যাঁ, বাঁচাবোই। ওকে কিছুই জানতে দেব না ওর গোপন কথা, না না না। ওর সেই পরম গোপন কথা শুধু আমারই জানা থাকবে, এই পৃথিবীতে আর কেউ তা জানবে না।

কেউ না!

না!

বুঝতে পারছেন? এবার বুঝতে পারছেন কি মশায়, কেন আমি যাত্রীদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকি, কেন তাদের হই-হুল্লোড় সইতে পারি নে? আমি যে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি এই জাহাজের খোলের মধ্যে চায়ের পেটি আর চীনা বাদামের ঝুড়ির মাঝখানে ও-ও শুয়ে আছে। দরজায় তালা, তাই ওর কাছে আমি যেতে পারিনে। কিন্তু সর্বক্ষণ ওর সান্নিধ্য পাই। সবাই যখন ডেকের ওপর হই-হল্লা করে, বা সেলুনে সেলুনে যখন নাচগানের হাট বসে যায়—তখনো আমি যেন ওর স্পর্শ অনুভব করি। জানি, আমি যে জানি—আমার কাছ থেকে কী ও প্রত্যাশা করে! এখনো আমার অনেক কিছু করবার আছে।

ওর গোপন কথা! হ্যাঁ, এখনো তা নিরাপদ নয়, যতক্ষণ না সেটা পুরোপুরী নিরাপদ হয়, প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ হবে না।

জাহাজের মাঝখান থেকে মৃদু কোলাহলের শব্দ ভেসে আসছে। নাবিকরা পাটাতন ধুতে শুরু করেছে। এই শব্দে হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন, উঠে দাঁড়ালেন।

এখন—এখন আমার যাওয়া উচিত। বিড় বিড় করে বললেন।

তাঁর দিকে তাকালেও মায়া হয়। সারা মুখে গভীর হতাশার ছাপ, অত্যধিক মদ্যপানে আর কান্নায় রক্তবর্ণ দুই চোখ।

হঠাৎ তাঁর ব্যবহার কেমন খাপছাড়া হয়ে গেল। সম্ভবত নিজেকে এভাবে প্রকাশ করে ফেলার জন্যে এখন তাঁর অনুতাপ হচ্ছে, আমার মত একজন অপরিচিত লোকের কাছে সব কিছু বলে ফেলে হয়ত মনে মনে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়েছেন।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আমি বললাম, বিকেলের দিকে আপনার কেবিনে যদি যাই, আপত্তি আছে?

বিষণ্ণ হাসলেন তিনি, ঠোঁট বেঁকালেন।

একটুক্ষণ ইতস্তত করে মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতার সুরে বললেন, ও, পরস্পরকে সাহায্য করা তো কর্তব্য, তাই না? কর্তব্য

কথাটা আপনার বড় প্রিয়, কিছু আগে এই কথাটা বলেই আপনি আমার দুর্বলতার ওপর ঘা দিয়েছিলেন। তাই না আমার মনের লাগাম আলগা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, আপনার সাধু উদ্দেশ্যের জন্যে ধন্যবাদ—আমি একা থাকতে পারলেই খুশি হব। কিছু মনে করবেন না, আমার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়েছে, কারুরই আর কিছু করবার নেই। সাত বছর এখানে চাকরী করেও কোন লাভ হল না—পেন্সন বাজেয়াপ্ত, কপর্দকশূন্য অবস্থায় এখন আমি জার্মানীতে ফিরছি। ভূতগ্রস্ত মানুষের এই বিধিলিপি। পরিণাম—মৃত্যু! আমার বেলায় হয়ত এই পরিণাম একটু শিগ্‌গীরই আসবে। হ্যাঁ, আপনার প্রস্তাবের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু কেবিনে আপনার চেয়েও সেরা সঙ্গি আমার আছে—হুইস্কির বোতল। ও এক মহা সান্ত্বনা। আরও একটি বন্ধু আছে আমার—পিস্তল। তাই, আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে। জানেন তো 'মানুষের অধিকারাবলী'র মধ্যে একটি অধিকার আছে যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না—আত্মহত্যার অধিকার—এর জন্যে কারো 'সাহায্যে'রও প্রয়োজন হয় না।

তীক্ষ্ণভাবে তিনি আমার দিকে চাইলেন, যুদ্ধং দেহি ভাব—কিন্তু আমি তো জানি মনের গভীরে কী অসহ্য লজ্জায় তিনি মরে যাচ্ছেন!

কোন কথা না বলেই হঠাৎ তিনি পিছন ফিরলেন, কেবিনের দিকে দ্রুত পা চালালেন।

এর পর মধ্যরাত্রে বহুবার ডেকে গেলেও তাঁর দেখা আমি আর পাইনি। এমনভাবে তিনি অদৃশ্য হয়ে রইলেন যে এক-একবার আমার মনে হত, এ-সবই ঘুমের ঘোরে শোনা এক স্বপ্ন-কাহিনী নয়ত ?
কিন্তু না, স্বপ্ন নয়, জাহাজেই এক ওলন্দাজ যাত্রীকে দেখলাম, শোক-পরিচ্ছদ তাঁর পরনে। শুনলাম, সম্প্রতি আকস্মিক রোগে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। কারো সঙ্গে তিনি কথা বলতেন না, সব সময় কেমন মন-মরা হয়ে থাকতেন।

অতঃপর নেপলস বন্দরে সেই দুর্ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আগেই বলেছি, সেই সময় অধিকাংশ যাত্রীই তীরে নেমে গিয়েছিল, আমিও গিয়েছিলাম এক অপেরায়।

সেখান থেকে কাফেতে পানাহার সেরে ফিরছি, হঠাৎ বন্দরের কাছাকাছি এসে দেখি রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেছে, আমাদের জাহাজের চারপাশে কয়েকটা নৌকা ঘোরাফেরা করছে, জলের ওপরে অনেকগুলো টর্চের আলো কি যেন খুঁজছে।

ডেকের ওপর কয়েকজন নাবিক চাপা স্বরে কথাবার্তা বলছিল। তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি?

জবাবটা সে এড়িয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যেই তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পরের দিন সকালে আমাদের জাহাজ জেনোয়া যাত্রা করল। তখনো আমি কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু জেনোয়াতে এক

ইতালীয় সংবাদপত্রে নেপলস বন্দরের ঘটনার চাঞ্চল্যকর বিবরণ দেখলাম।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, যাত্রীদের প্রশ্নোত্তর এড়াবার জন্যে রাত্রির অন্ধকারে পূর্ব-ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনীত একটি কফিন জাহাজ থেকে নৌকোয় নামানো হচ্ছিল। কফিনে এক মহিলার মৃতদেহ ছিল। তাঁর স্বামী [সমাধিস্থ করার জন্যে ইনি কফিনটি দেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন] আগে থেকেই নৌকোয় অপেক্ষা করছিলেন। কফিনটিকে জাহাজ থেকে মাঝপথে নামান হয়েছে, আচমকা ওপরের ডেক থেকে খুব ভারী একটা জিনিস কফিনের ওপর এসে পড়ল। ফলে দড়িদড়া ছিঁড়ে কফিনটা ছিটকে গিয়ে পড়ে নৌকোর ওপর, নৌকোটাও উল্টে যায় সঙ্গে সঙ্গে। ধাতুর পাত দিয়ে মোড়া ছিল বলে কফিনটা ডুবে যায়, তবে সৌভাগ্যের বিষয়, কোন প্রাণহানি হয়নি। অনেক কষ্টে সেই বিগতদার ভদ্রলোক ও অন্যান্যকে জল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এই দুর্ঘটনার কারণ কি ?

রিপোর্টার বলছে—একটা পাগল নাকি জাহাজ থেকে কফিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে এই দুর্ঘটনা। সম্ভবত কফিন যারা নামাচ্ছিল তাদের দোষত্রুটি ঢাকবার জন্যেই এই পাগলের কাহিনীটি আমদানী করা হয়েছে। আসলে, কফিন নামাবার জন্যে যে দড়ি ব্যবহৃত হয় তা আদপেই মজবুত ছিল না, এবং

কফিনটাও অত্যন্ত ভারী হওয়ায় সেটা সহজেই ছিঁড়ে যায়। যাহোক, এ সম্পর্কে তদন্ত চলছে।

এই সংবাদপত্রেরই অন্য এক জায়গায় আরেকটা ছোট্ট খবর ছিল।

সেটা হল—বছর পঁয়ত্রিশেক বয়েসের একটি লোকের মৃতদেহ নেপলস বন্দরে পাওয়া গেছে। কেউ তাকে চেনে না। মৃতদেহের মাথায় গুলির চিহ্ন আছে।

কফিনের দুর্ঘটনার সঙ্গে কেউই এই সংবাদটিকে এক করে দেখে নি।

কিন্তু, আমি যখন সেই ছোট্ট সংবাদটুকু পড়ছিলাম, ছাপা অক্ষরগুলোর ভেতর থেকে একটি দুর্ভাগা মানুষের প্রেতায়িত মূর্তি বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

তার কাহিনী তো আগেই বলেছি।

॥ পুরনো জীবন-ব্যবস্থা, পুরনো মূল্যবোধ তখন ভেঙে পড়ছে—নতুন জীবন-ব্যবস্থা, নতুন মূল্যবোধের তবু সৃষ্টি হয়নি। সংশয়-সন্দেহ অবিশ্বাসের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও মুষ্টিমেয় যে কজন মহৎ শিল্পী তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে সুস্থতর জীবনাদর্শের প্রতি একটি নিবিড় মমত্ববোধ লালন করতে পেরেছিলেন, জাইগ তাঁদের অন্যতম। জীবনকে তিনি ভালবাসতেন, মৃত্যুকে তিনি চাননি—স্বয়ংবৃত মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তিনি তা প্রমাণ করলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে তিনি মৃত্যুহীন মহা-জীবনেরই একটি অর্থনিগূঢ় ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। 'গোধূলির গান' তাঁর এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভালবাসা আর ঘৃণা, বিশ্বাস আর সংশয়, জিঘাংসা আর জীবনপ্রেম—মানবমনের এই পরস্পর বিরোধী বৃত্তির সমন্বয় ঘটিয়ে এক অলৌকিক রহস্যের এখানে দ্বারোম্মোচন করা হয়েছে। অনুতাপজর্জর সংশয়দগ্ধ এক নায়ককে কেন্দ্র করে আনন্দে-আতঙ্কে বিস্ময়ে-বেদনায় গড়ে উঠেছে এই আশ্চর্য উপন্যাস ॥